মা আনন্দময়ী

অমৃতবার্তা

VOL.-17 JULY, 2013 No. 3

SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA

Branch Ashrams

1. AGARPARA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. P.O. Kamarhati, Calcutta- 700058 (Tel. : 25531208)
2. AGARTALA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. Palace Compound P. O. Agartala-799001. West Tripura (Tel. : 0381-2208618)
3. ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Patal Devi. P. O. Almora-263602, (Tel. : 05962-233120)
4. ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P. O. Dhaul-China. Almora-263881, (Tel. : 059620-262013)
5. BHIMPURA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhimpura. P. O. Chandod, Baroda-391105, (Tel. : 02663-233208+233782)
6. BHOPAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P. O. Bairagarh, Bhopal-462030, M. P. (Tel. : 0755-2641227)
7. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kishenpur. P. O. Rajpur, Dehradun-248009 (Phone : 0135-2734271)
8. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kalyanvan, 176, Rajpur Road, P. O. Rajpur, Dehradun-248009, (Phone : 0135-2734471)
9. DEHRADUN : Shree Shree Ma Andamayee Ashram. P.O. Raipur Ordnance Factory, Dehradun-248010
10. JAMSHEDPUR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Bhatia Park, Kadma, Jamshedpur-831005
11. KANKHAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P. O. Kankhal, Hardwar - 249408, (Tel. : 01334-312565, 246575)
12. KEDARNATH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Himlok. P. O.Kedarnath, Rudraprayag
13. NAIMSHARANYA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Puran Mandir. P. O. Naimisharanya, Sitapur-261402, U. P. (Tel. : 05862-285254)

মা আনন্দময়ী — অমৃতবার্তা

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর দিব্য জীবন

ও

অমূল্যবাণী সম্বলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বর্ষ ১৭ | জুলাই ২০১৩ | সংখ্যা ৩

★

বার্ষিক চাঁদা (ডাক ব্যয়সহ)

ভারত — ১০০ টাকা

বিদেশে — ১৪ ডলার অথবা ৭৫০ টাকা

প্রতি সংখ্যা — ৩০ টাকা

মুখ্য নিয়মাবলী

❋ ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাংলা, হিন্দী, গুজরাতী ও ইংরাজী এই চার ভাষায় পৃথক পৃথকভাবে বৎসরে চারবার জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই এবং অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হইয়া থাকে। পত্রিকার বর্ষ জানুয়ারী সংখ্যা হইতে আরম্ভ হয়।

❋ প্রধানতঃ শ্রী শ্রী মায়ের দিব্য জীবন ও অমূল্যবাণী বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশনই এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। অবশ্য দেশ-কাল-ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে কোন আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ এবং বিশিষ্ট মহাপুরুষদের জীবনী ও উপদেশ সম্বলিত লেখা সাদরে গৃহীত হইবে। নিতান্ত ব্যক্তিগত অনুভব ব্যতীত শ্রী শ্রী মায়ের দিব্যলীলা বিষয়ক লেখাও শ্রী শ্রীমায়ের অগণিত ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে আশা করা যাইবে।

❋ প্রতিটি লেখা সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ট অক্ষরে লিখিত থাকা বিশেষ আবশ্যক। কোনও কারণবশতঃ লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত না হইলে লেখকের নিকট ফেরৎ পাঠান অসুবিধাজনক।

❋ অগ্রিম বার্ষিক চাঁদা কেবলমাত্র মনি অর্ডার বা ডিমান্ড ড্রাফট দ্বারা " Managing Editor— Ma Anandamayee Amrit Varta" এই নামে পাঠাইবার নিয়ম।

❋ পত্রিকা সম্পর্কিত যোগাযোগ নিম্নলিখিত ঠিকানায় করিতে হইবে —

Managing Editor,
Ma Anandamayee - Amrit Varta
Mata Anandamayee Ashram
Bhadaini, Varanasi - 221 001

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম ঃ-

সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা — ২০০০/- বাৎসরিক
অর্দ্ধেক পৃষ্ঠা — ১০০০/- "
১/৪ পৃষ্ঠা — ৫০০/- "

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু সহ অগ্রিম টাকা উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক **ডঃ গীতা ব্যানার্জী** দ্বারা শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘ, ভাদাইনী, বারাণসী - ২২১ ০০১ উঃপ্রদেশ হইতে প্রকাশিত এবং রত্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস, বি ২১/৪২ কামাচ্ছা, বারাণসী - ১০ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক — ব্রহ্মচারিণী ডঃ গীতা ব্যানার্জী (ইন্চার্জ)

বিষয়-সূচী

Didi writes :

Ma lays a great deal of stress on Gayatri japa for Brahmins. She tells each one to do as much Gayatri japa as he possibly can. In Solan Ma had explained the meaning of the Gayatri to me which I have recorded as follows :

The meaning of Gayatri :

"He who creates, preserves and destroys, whose form is universal, He Himself inspires our intellect, He Himself is Parabrahma and the Knower within each creature; I meditate on His venerable effulgence."

—Sri Sri Ma Anandamayi

With respectful pronams at the lotus feet of Ma
from
Elizabeth Roy

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

(পূর্বানুবৃত্তি)

— শ্রী অমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত

জাগতিক বাসনা নাশের উপায়—

১৫ই আশ্বিন, শুক্রবার (ইং ২।১০।৫৩)—

আজ বেলা ১১টার সময় পাঠ ও কীর্তন শেষ হইলে ডাঃ পান্নালাল মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুনিয়াছি যে বাসনা থাকিলে নাকি বারবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়?"

মা। হাঁ।

ডাঃ পান্নালাল-বাসনা নষ্ট করিবার উপায় কি? আমাদের এক বাসনা শেষ হইলেই আবার উহার জায়গায় অন্য বাসনা জাগিয়া উঠে।

মা-তোমাদের কোন বাসনাই শেষ হয় না। যদি একটি মাত্র বাসনা শেষ করিতে পারিতে তবে সকল বাসনাই শেষ হইত, কারণ একের মধ্যেই অনন্ত, আবার অনন্তের মধ্যেই এক। সেই জন্যই বলি যে তোমাদের কোন বাসনাই শেষ হয় না; উহারা লুকাইয়া থাকে মাত্র। যদি শেষ হইত তবে একই বাসনা বারবার তোমাদের মনে জাগে কীরূপে? কাজেই বাসনা শেষ করিতে হইলে শবাসন (শব আসন) ছাড়িয়া 'স-বাসনা' করিতে হয়। 'স-বাসনা' অর্থাৎ ভগবান লাভের বাসনা হইলেই অন্যান্য জাগতিক বাসনা নষ্ট হইয়া যায়। তোমরা যে বাসনা লইয়া আছ, ওইগুলি অস্থায়ী বলিয়া মৃত্যু তুল্য। তোমরা জাগতিক বাসনা করিয়া যেন মৃত্যুকেই আসন করিয়া বসিয়া আছ এবং উহা পূর্ণ করিতে জন্ম জন্মান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ। কাজেই সেই বাসনা করিতে হয় যাহা করিলে মৃত্যুর ও মৃত্যু হইয়া যায়। উহা ভিন্ন বাসনা নাশ করিবার আর অন্য উপায় নাই।

ডাঃ পান্নালাল-মা, ঐদিকেই যে মন যায়না।

মা–রোগীও ঔষধ খাইতে চায় না। তাহাকে যেমন জোর করিয়া ঔষধ খাওয়ান হয়, injection দেওয়া হয়। সেইরূপ জোর করিয়া ভগবানের নাম করা। ভাল লাগে না, তবুও নাম ছাড়িতে নাই। এইরূপ করিতে করিতেই নামে রস পাওয়া যায়।

একটি এদেশীয় যুবক–আমরা, যাহারা গৃহস্থ, আমাদের কী ভাবে চলিতে হইবে?

মা–তোমরা Manager হইয়া যাও। কাহার Manager তাঁহার অর্থাৎ ভগবানের। নিজের ছেলে মেয়েদিগকে কুমারী ও বাল গোপাল মনে করিয়া সেবা করা। স্ত্রীকে গৃহলক্ষ্মী জ্ঞান করা, পিতা মাতাকে যাহাদের হইতে তুমি এই জীবন লাভ করিয়াছ তাহাদিগকে সাক্ষাৎ ভগবান জ্ঞানে সেবা করিয়া যাও। নিজের বাড়িকে ভগবানের মন্দির বলিয়া মনে কর। কারণ এই খানেইত ভগবান বিভিন্ন রূপে আছেন। জীবের মধ্যেই ভগবান আছেন। 'যত্রজীব তত্র শিব' যত্র নারী তত্র গৌরী–এই ভাবে সকলের সহিত ব্যবহার কর, তবেই তুমি ভগবানের manager হইয়া জীবন যাপন করিতে পারিবে। এইভাবে জীবন যাপন করিলে তোমার আর কাহারও উপর রাগ, দ্বেষ, হিংসা ইত্যাদি থাকিবে না। কেননা সকলেই যে ভগবানের রূপ। একমাত্র তিনিই যে বিভিন্ন রূপে বিরাজ করিতেছেন। কাজেই কাহার উপর রাগ, দ্বেষ, করিবে?

যুবক– এই ভাবে জীবন যাপন করার কি আমাদের শক্তি আছে?

মা– তোমাদের যতটুকু শক্তি আছে, তাহা এই কাজে লাগাও, বাকি যাহা থাকে তাহা তিনিই পূরণ করিয়া দিবেন।

গ্রন্থি মোচন না হওয়া পর্যন্ত লোভ ক্রোধাদির রিপু হইতে অব্যাহতি নাই—

এমন সময় বৈদ্যনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ফুল মালা লইয়া আসিলেন। তিনি মাকে মালা পরাইয়া দিয়া বিল্বপত্র ও পুষ্পদ্বারা অঞ্জলি দিলেন। পরে আসন গ্রহণ করিয়া মাকে বলিলেন, 'যদি শুধু পত্র পুষ্পে ভগবান তুষ্ট হন তাহা হইলেই ভাল, তিনি যদি অন্য কিছু চান তবেই মুশকিল।

মা–(হাসিয়া) হাঁ, তিনি পত্রপুষ্পেই সন্তুষ্ট হন। পত্র পুষ্প দিয়াইত লোকে ভগবানের পূজা করে, আরাধনা করে; কিন্তু এই পত্র পুষ্পই বা ভগবানকে কে দেয়?

এই কথা মা বেশ জোর দিয়া দুই তিনবার বলিলেন। তখন বৈদ্যনাথ শাস্ত্রী মহাশয় মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে ভগবান কে পত্র পুষ্প দেয়?'

মা–তুমি।

শাস্ত্রী মহাশয়–(বিনীত ভাবে) আমি আর কোথায় দেই।

মা–(হাসিয়া) আমি ত 'আমি' বলিনাই, আমি বলিয়াছি তুমি (সকলের হাস্য)

মায়ের উত্তর শুনিয়া বৈদ্যনাথ শাস্ত্রী মহাশয় থতমত খাইয়া গেলেন। পরে তিনি বলিলেন, 'আমিকি আমাকে কিছু দিতে পারি না?'

মা–(হাসিয়া) তাহা পারিবে না কেন? আমি শুধু বলিয়াছি যে আমি যাহা বলিয়াছি তুমি ঠিক তাহা না বলিয়া অন্য কথা বলিয়াছ।

ইহা লইয়া কিছুক্ষণ হাসাহাসি হইল। পরে মা বলিতে লাগিলেন, "বলা হয় না যে, আপনাতে আপনি, আমাকে লইয়া আমি খেলিতেছি, তোমাকে লইয়া তুমি খেলিতেছ। এগুলি এক কথাই। 'আমি' আর 'তুমি' একজনকেই বুঝায়। জগতে যাহা কিছু দেখা যায় সবই যে ভগবানের খেলা, তাঁহাকে লইয়াই খেলিতেছেন। এখানে দ্বিতীয় আর কোথায়? লোভ, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি জগতে যাহা কিছুর প্রকাশ দেখিতেছ এ সবই যে তিনি। এগুলি কথার কথা নয়, ইহা বাস্তবিকই প্রত্যক্ষ হয়। এ শরীরের সাধনের খেলা যখন চলিতেছিল তখন অনেক সময় ভোলানাথ এ শরীরটার উপর রাগ করিত। তাহাকে রাগ করিতে দেখিয়া এ শরীর বলিত, 'ইহাও একটা ভগবানের রূপ', ঐ কথা শুনিয়া ভোলানাথ আরও চটিয়া যাইত। সে ক্রুদ্ধ হইয়া যাহা কিছু বলিত বা যেমন অঙ্গভঙ্গি করিত উহাদেখিয়াও এ শরীর ঐ এক কথাই বলিয়া যাইত– 'হে ভগবান, ইহাও তোমার এক রূপ।' পরে অবশ্য ভোলানাথ আমার ঐ সব কথা শুনিয়া রাগ করিত না। সে তখন বুঝিতে পারিয়াছিল যে আমার ঐ কথা ঠাট্টা হিসাবে বলা নয়। সঙ্গগুণ ত আছে। এই জন্যই সৎসঙ্গের কথা বলা হয়। যে যাহার সঙ্গ করে সে ঐ রঙেই রঙিন হইয়া উঠে। বাস্তবিক এমন এক স্থিতি আছে যখন বুঝা যায় যে জগতে যাহা কিছু আছে, উহা সমস্তই ভগবানের রূপ। সেই জন্যই ত মায়াকে অনাদি, অনন্ত বলা হয়। যে ঐ স্থিতি লাভ করে তাহার মধ্যে লোভ ক্রোধাদির ভাব দেখা গেলেও উহা কিন্তু অজ্ঞান অবস্থার লোভ ক্রোধ নয়। তুমি হয়ত কোন মহাত্মাকে দেখিলে যে তিনি একটি সুন্দর ফুল তোমার নিকট হইতে চাহিয়া নিলেন। ইহা দেখিয়া তুমি মনে করিতে পার যে ইনি কেমন মহাত্মা? সুন্দর ফুলের উপর ইহার দেখি মোহ আছে। কিন্তু ঐ মহাত্মা ফুলটি লইয়া হয়ত অন্য কাহাকেও দিয়া দিলেন যাহার ফলে ঐ লোকটির জাগতিক সৌন্দর্যের প্রতি মোহ কাটিয়া গেল। কোন খাবার সামগ্রীর বেলায়ও ঐ রূপ হইতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে মহাত্মারা ত অপর কাহারও নিকট কিছু চান না বা অপর কাহাকেও কিছু দেন না। তিনি যে তাঁহাকে লইয়াই খেলা করেন। জাগতিক ভাবে যাহা ক্রোধ বলিয়া মনে হয়, মহাত্মাদের নিকট উহা ব্রহ্মতেজ রূপে প্রকাশ হয়। উহা বাস্তবিকই বড় মধুর, তাঁহাদের লোভ, ক্রোধ, ঘৃণা–এসব কিছুই নাই। তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াও ঐ সব মনের মধ্যে আনিতে পারেন না। কারণ তাঁহাদের ঐ সব গ্রন্থি খুলিয়া গিয়াছে কিনা। কাজেই কিসের উপর দাঁড়াইয়া তাঁহারা ক্রোধ প্রকাশ করিবেন? যাদের ঐ সব গ্রন্থি আছে তাহারা যখন ঐ স্থানে গিয়া দাঁড়ায় তখন তাহাদের যাহা প্রকাশ হইবার তাহা হইয়া যায়। কিন্তু কাহারও ঐ সব গ্রন্থি খুলিয়া গেলে ঐখানে সে দাঁড়াইবার স্থান পায় না। তাঁহার Paralysis-এর মত অবস্থা হয়, অর্থাৎ ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলেও সে চেষ্টা করিয়াও ক্রোধ প্রকাশ করিতে পারে না। তখন সে

বুঝিতে পারে যে, যে যাহা বলিতেছে বা করিতেছে ঐ অবস্থায় ঐরূপই হইয়া থাকে। লোককে Criticise (সমালোচনা) করিতে দেখিয়া সে মনে করে যে ঐ স্থিতিতে ঐরূপই হইয়া থাকে। ইহাই নির্দ্বন্দ্ব অবস্থা। কিন্তু অজ্ঞান অবস্থা হইতে ব্রহ্মতেজ লাভ না করা পর্যন্ত মাঝে যে সকল stage-এর ভিতর দিয়া যাইতে হয় সেইগুলি বড় কঠিন। বিচার করিয়া চলিলে ও লোভ, ক্রোধ, ঘৃণা ইত্যাদির হাত হইতে মুক্তি নাই। যতক্ষণ পর্যন্ত গ্রন্থিভেদ হইয়া ব্রহ্মতেজ প্রকাশ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই গুলির আক্রমণ চলিবেই। তবে বিচার করিতে হইবে না-এ কথা বলা হইতেছে না। সর্বদা বিচারের পথে থাকিলেও গ্রন্থি মোচনের সহায়তা হয়। কাহারও ব্যবহারে যদি তোমাদের মধ্যে ক্রোধ বা ঘৃণার ভাব উপস্থিত হয় তবে এই ভাবে বিচার করিয়া নিজকে শান্ত রাখিতে চেষ্টা করা উচিত যে, ঐ লোকটি যে ব্যবহার করিতেছে, তাহার অবস্থায় ঐরূপ করাই স্বাভাবিক। সেইজন্য তাহাকে ঘৃণা করা উচিত নয়। ঘৃণা কী? না, যাহা গ্রহণ যোগ্য নয়।"

এই ভাবে কথা বলিতে বলিতে বেলা ১২টা বাজিয়া গেল।

গান

— মাতৃঅন্তঃপ্রাণ শ্রীনলিনী কান্ত ভট্টাচার্য

জাগো জাগো জাগো
স্বার্দ্ধো ত্রিবলয়াকৃতি সুপ্তা নাগিনী তুমি।
মূলাধার মহাভূমে জাগো।
মাগো জাগো জাগো জাগো।
আরোহিয়া নাম রথে.
চল মা সুষুম্না পথে,
ঘনঘোর বেগে তুমি চল।
জাগো...
থমকি থমকি চল রন্ধ্র পথে,
হংস খেলিছে দেখ রম্য বনে।
হংসে কর মা জয়,
যাহে বিপরীত হয়,
ঊর্ধ্বঃ অধঃ মহাগতি হর মা হর।
ঐ হের ঝল মল শোভে মা সহস্র দল,
বিষ হরি হের মাগো আনন্দ হ্রদে।
হলাহল হোল শেষ অমৃতের পরিবেশ।
নমো নমো নারায়ণ নমো হৃষিকেশ।
নমো নমো নারায়ণ নমো হৃষিকেশ।

'শ্রীশ্রী মায়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়'

(পূর্বানুবৃত্তি)

— স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থ

কুঞ্জমোহনবাবুর আদেশমত আমি মুদির দোকান হইতে এক-পোয়া চাল, একপোয়া মুগের ডাল এবং একপোয়া সৈন্ধব লবণ ক্রয় করিয়া আনিলাম। মাটির হাঁড়িতে চাল, ডাল ধুইয়া জলসহ হাড়ি ঘুটের আগুনের উপর চড়াইয়া দেওয়া হইল। খিচুড়ি কিছুতেই উথলাইয়া উঠিতেছে না দেখিয়া আমি একেবারে ধৈর্যচ্যুত হইয়া পড়িলাম। মা আপনার শয্যায় শুইয়া শুইয়া আমার রন্ধন ক্রিয়া দেখিতেছেন। আমার ধৈর্য যখন শেষসীমায় তখন খিচুড়ি আমার অবস্থা দেখিয়া কৃপাপূর্বক মৃত্তিকাপাত্রে উথলিয়া উঠিলেন। খিচুড়ি উথলিয়া উঠায় আমি যে একজন সুনিপুণ সূপকার এই আত্মশ্লাঘায় আমার মনটা ভরিয়া গেল। আমি আর বিলম্ব না করিয়া সৈন্ধব লবণের একপোয়া পরিমাণের খণ্ডটা হাঁড়ির মধ্যে দিতে উদ্যত হইতেই মা আর বিছানায় শুইয়া থাকিতে পারিলেন না। অকস্মাৎ শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "কর কি? কর কি? সব লবণটাই দিয়া দিলে নাকি?" আমি থমকিয়া প্রবীণ পাচকের মত বলিয়া উঠিলাম, 'খিচুড়িতে লবণ দিব না?' মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কতটা চাউল ডাইলের খিচুড়ি পাক করিতেছ?" আমি অতি গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলাম, 'একপোয়া চাল আর একপোয়া ডাল।' আমার উত্তর শুনিয়া মা বলিলেন, "একপোয়া চাউল আর একপোয়া ডাইলের খিচুড়িতে কি এতখানি লবণ লাগে?" তারপর লবণের ডেলা (খণ্ড) হইতে ভাঙ্গিয়া মা-ই দেখাইয়া দিলেন কতটুকু লবণ দিতে হইবে। মায়ের নির্দেশমত তাহাই খিচুড়ির মধ্যে নিক্ষেপ করিলাম। সবটা লবণ খিচুড়িতে দিলে উহা আর মুখে দেওয়া যাইত না। ইহা হইতেই বিজ্ঞ পাঠক ও পাঠিকারা অনুমান করিতে পারিবেন আমার রন্ধন বিদ্যার দৌড় কত?

এদিকে আমি যখন খিচুড়ি রাঁধিতেছিলাম, ঐদিকে কুলদাবাবুর কি ভাব হইল, তিনি একটা আমগাছের উচু ডালে গিয়া চড়িয়া বসিলেন। যখন আমার রন্ধনকার্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে তখন তিনি আম্রবৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া একটা তাজা কুমড়ার ডগা লইয়া আসিলেন। কুমড়ার ডগা দেখিয়া মা অমনি বলিলেন, "কুমড়ার ডগা আনিয়াছে ভালই হইয়াছে। উহা ধুইয়া খিচুড়ির মধ্যে দিয়া দেও।" মায়ের কথামত তাড়াতাড়ি কুমড়ার ডাঁটা,

পাতা ও ডগা ধুইয়া খিচুড়ির হাঁড়ির মধ্যে ছাড়িয়া দিলাম। এইসব দেওয়াতে পাত্রটি ভরিয়া গেল। খিচুড়ি নাড়াচাড়া করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। ঐ কার্যটি আমগাছের একটি সরু শাখাদ্বারা করা হইতেছিল। অনেক তোড়জোড়ের পর কোন রকমে পাতা দিয়া ধরিয়া খিচুড়ির হাঁড়ি মাটিতে নামাইলাম। কলাপাতায় উহা ঢালা হইল। প্রথম উপর হইতে কুমড়ার ডাঁটাপাতা এবং পরে জলজলে বা পাতলা খানিকটা চাল-ডাল সিদ্ধ পড়িল। না আছে ইহাতে হলুদ, না লঙ্কা, না মসলা, না ঘি আর না তেল। এই বস্তুটির নাম পাকশাস্ত্রে বা পাকপ্রণালীতে অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যাইবে না।

আমার এই রান্নার বহর দেখিয়া মা নিশ্চয়ই কিছু আশ্চর্য হন নাই, কারণ আমি তো তাঁহাকে তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে বহু পূর্বেই নিবেদন করিয়াছিলাম যে 'আমি রাঁধিতে জানি না'। কোন প্রকারে রন্ধনপর্ব তো শেষ হইল। এখন আরম্ভ হইবে শ্রীশ্রীমায়ের ভোগপর্ব। আসন পাতিয়া মাকে ভোগে বসান হইল। জায়গায় জলের ছিটা দিয়া তাঁহার সম্মুখে খিচুড়ির পাতাখানা টানিয়া লইলাম। মা নিজের হাতে খান না সেইজন্য আমাকে খাওয়াইয়া দিতে হইবে। আমি এই প্রথম মাকে খাওয়াইতে যাইতেছি। এই অধিকারটি প্রাপ্ত হবার ফলে আনন্দে আমি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলাম। কিন্তু তখনও ভাবিয়া দেখি নাই যে মাকে খাওয়ান অত সহজ কথা নয়। তাঁহার মুখে খিচুড়ি দিতে গিয়া দেখি আমার হাতভরা কালি। খিচুড়ির হাঁড়ি পাতা দিয়া ধরিয়া নামাইবার সময় আমার দুই হাতে কালি লাগিয়াছিল। মা আসনে বসিয়া রহিলেন, আমি কুঁয়ার পাড়ে হস্ত প্রক্ষালন করিতে চলিলাম। পাথরে হাত ঘর্ষণ করিতে করিতে হাত লাল হইয়া গেল, তথাপি হাতের সব কালি উঠিল না, মনের ভিতরের কালি যে কি করিয়া উঠিবে তাহা মা-ই জানেন। সেই কর্ম আমার সাধ্যের অতীত। এই অবসরে খিচুড়ি একটু ঠাণ্ডা হইল, নচেৎ উহা মায়ের মুখে দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন হইত এবং তিনিও ঐ গরম খিচুড়ি মুখে লইতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। আমার সেই কালি-মাখা মলিন হস্তেই মায়ের শ্রীমুখে খিচুড়ির গ্রাস তুলিয়া দিতে লাগিলাম। আমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই মনে হয় মা দুই চারি গ্রাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, নতুবা ঐ পদার্থটা না রূপে, না রসে, না গন্ধে কোন প্রকারেই মুখে লইবার যোগ্য ছিল না। তবে একটা কথা আছে–দেবতারা ভোজ্য পদার্থের দিকে দৃষ্টি প্রদান করেন না, তাহারা দেখিয়া থাকেন দাতার ভাব। তাই না বলা হয় ভাবগ্রাহী জনার্দন। যেন তেন-প্রকারেণ ভোগক্রিয়া সমাধা করিয়া মাকে আমিই কোন রকমে আচমন করাইলাম। মায়ের মুখশুদ্ধি কিছু দিয়াছলাম কিনা মনে পড়ে না। না দিবারই কথা, কারণ আমাদের সঙ্গে সেখানে লবঙ্গাদি কিছু নিশ্চয়ই ছিল না।

শ্রীশ্রী মায়ের ভোগের পর কুলদাবাবু স্নান করিয়া প্রসাদ পাইতে আসিলেন। আশ্চর্যের বিষয় তিনি মাকে এত কাছে ও একান্তভাবে পাইয়াও কিন্তু মায়ের সান্নিধ্যে বড় আসেন নাই। তিনি মা হইতে দূরে দূরেই ছিলেন। অথচ মায়ের উপর তাঁহার শ্রদ্ধাভক্তি কিছু কম নয়। আমরা দুইজনে প্রসাদ ভাগ করিয়া লইবার পরও হাঁড়িতে খানিকটা অবশিষ্ট রহিয়া গেল। মায়ের প্রসাদ বলিয়াই উহা গ্রহণ করা হইয়াছিল নহিলে উহা মুখে লইবার যোগ্য কোন প্রকারেই ছিল না। হজমের পক্ষেও যে উহা সুপাচ্য ছিল তাহা বলিতে পারা যায় না, যেহেতু উহার কতকটা অংশ গলিয়া একেবারে কাদা হইয়া গিয়াছিল বাকী অংশটা সিদ্ধই হয় নাই। অবশ্য পরিপাকের জন্য একমাত্র ভরসা ভগবদ্বাক্য। শ্রীভগবান্ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন–

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্॥

অর্থাৎ আমিই বৈশ্বানর হইয়া প্রাণিগণের দেহকে আশ্রয় করি এবং প্রাণ ও অপান এই দুইভাগে বিভক্ত হইয়া চারি রকম অন্নের পরিপাক সাধন করিয়া থাকি।

এবং শ্রুতিতেও নির্দেশ পাওয়া যায় যে–

"অয়মগ্নির্বৈশ্বানরঃ, যোহয়মন্তঃ পুরুষে যেনৈতদন্নং পচাতে।"

শ্রুতিতেও এই কথার প্রতিধ্বনি প্রাপ্ত হওয়া যায় যে এই আত্মাই বৈশ্বানর অগ্নি, যে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অন্নের পরিপাক করে।

উপরের বর্ণিত ঘটনাটির দ্বারা প্রমাণিত হইল যে রন্ধন কার্যে আমার পারদর্শিতা কত! এই কারণেই মনে হয় শ্রীশ্রীমা আমাকে বহুপূর্বে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন–আমি রাঁধিতে জানি কি না?

গুরুপ্রিয়াদিদির অপ্রকাশিত ডায়েরীর কয়েক পৃষ্ঠা

চিত্রার ১২/১০/৭৬ তারিখে লেখা চিঠি পাইলাম লিখিয়াছে–উৎপলদা ও অঞ্জলি আসিয়াছে। তার হাতে চিঠি দেই, পেয়েছেন ত?

গতকাল দুপুরে স্বামীজীর খুব কাঁপিয়া জ্বর আসে। মাকে ডাকিতে হয়। ভুল বকিতেছিলেন, শ্বাসের গতিও ঠিক ছিল না। স্বামীজী হলের পাশের ঘরে, মা মার বাড়ীতে। গঙ্গা আসিয়া বলা মাত্র মা তখনি দুপুর ৩॥টায় স্বামীজীর কাছে গেলেন। কিছুক্ষণ শিয়রে বসিয়া রহিলেন। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হইল। আজ ডাক্তাররা দেখিয়া বলিল ম্যালেরিয়া। গঙ্গা দেখাশোনা করিতেছে। মনে হয় এবারকার ফাঁড়া কাটিয়া গেল।

মার শরীর মোটামুটী। কাশি খুব আছে। বিরজানন্দজী আসিয়াছেন কাজও হইতেছে। আজ রাতুর রাজার সম্বন্ধীরা আসিল, খাওয়া দাওয়া করিয়া চলিয়া গেল। চিঠির বস্তাও শূন্য করিয়া থলিটা কাচা হইল। কয়েকখানা হিন্দী চিঠি অনসূয়ার বাকী। বাংলা ইংরাজী সব শেষ। ৪০০চিঠি জমিয়াছিল। এখন মার শুনিবার খেয়াল ছিল, তাই একসঙ্গে ৪/৫ ঘণ্টা শুনিয়া উত্তর দিয়াছেন। মা উপরের ঘরে বিরজানন্দ সহ কাজে।

গভর্ণর ১৫ই দুপুরে আসিবে, রাত্রিতে খাইবে ১৬ই দুপুরে আসিবে খাওয়া দাওয়া করিয়া যাইবে। সুতরাং ১৫/১৬ই বিরাট হৈ চৈ। ১৭ই সাইগল পার্টীরা রামায়ণ করিবে, খাইবে। অতএব কাল অবধি মার বিশ্রাম। পানুদারও কদিন জ্বর হওয়ায় শরীর সুস্থ নয়। সন্ধ্যা হইতেই শুইয়া পড়েন। এখানে রাত ৯টায় বাতি জ্বলে। তার আগে অন্ধকার। কাশীতে কাজলকে উড়ুপার চিকিৎসাধীনে পাঠান হইয়াছে। অপারেশন হওয়ার কথা। তুলসী ভালত? প্রণাম নিবেন। ইতি চিত্রা।

পুঃ– ত্রিপুরারিদার বক্তৃতা রোজ ১ ঘণ্টা হয়। মামীমাকে খবর পাঠান, উহারা দিল্লী আসিয়াছে। খবর পাইলাম মা যে বড়ি সকালে জলের সঙ্গে নিত্য খান, তা ফুরাইয়া গিয়াছে। মামী যেন তৈরী করিয়া রাখে। আপনার শরীর সুস্থ রাখিতে মা বলিলেন। আশ্রমের সবাই কেমন আছে?

পানুর নৈমিষারণ্য হইতে ১৫/১০ তারিখে লিখিত একপত্র পাওয়া গেল। লিখিয়াছে– দিদি, আশা করি, আমার আগের চিঠিখানি পাইয়াছ। মার বিশ্রাম মোটামুটি একরকম হইতেছে। তবে বিরজানন্দজী খাতাপত্র নিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং মার বিশ্রাম যে কতদূর হইবে সেটা অনুমান করিয়া নিতে পারিবে। স্বামীজীর এর মধ্যে ১০৩/১০৪ জ্বর হইয়াছিল। এখনও সুস্থ

নয়। এখানে ডাক্তার ও নাই সেই জন্য সকলেই একটু বিব্রত।

মার শরীর পূর্বাপেক্ষা কিছুটা যেন সুস্থ দেখা যায়। কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্রাম পাইলে হয়ত অনেকটা বেশী উন্নতি হইত।

কলিকাতা হইতে ছবি তাহার বিধবা বোন ও ছেলে মেয়েদের নিয়া মার কাছে আসিয়াছে। দিল্লী হইতে ও কেহ মার কাছে গিয়াছে।

গতকাল গভর্ণরের আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধু পরিবার প্রায় ১৮/১৯ জন মার দর্শনের জন্য আসিয়াছিলেন। সকলেই প্রসাদ পাইয়া গিয়াছেন। পূর্ব প্রোগ্রাম অনুযায়ী মার ২১শে ভোর বেলা পৌঁছিবার কথা। সঙ্গে প্রায় ১৮/১৯ জন থাকিবে।

পাটনাতে হাতোয়ার মহারানীর ভাগবত সপ্তাহ ২৬শে নভেম্বর হইতে ৩রা ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থির হইয়াছে। তার আগে করোলীতে ১৮ই হইতে ২১শে নভেম্বর পর্যন্ত শতচন্ডী অনুষ্ঠান। পাটনার পরেই ৪/৫ তারিখ নাগাদ মার রাঁচী যাওয়ার ও কথা হইতেছে। সুতরাং এখন হইতে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ অবধি একেবারে বাঁধা। প্রণাম নিও ইতি পানু।

২১।১০।৭৬

মা আজ প্রায় ৮টায় আশ্রমে আসিলেন। শুনিলাম রাস্তায় হাসপাতালে মা নারায়ণ দাসকে দেখিয়া আসিয়াছেন। সে মাকে দেখিয়া আনন্দে হাত–তালি দিয়াছিল, এবং খাট হইতে হাত নামাইয়া মায়ের পা ছুঁইবার চেষ্টা করিতেছিল। মা তাহার হাত ধরিলেন। মার দর্শনের জন্য অনেকেই আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। মাকে পাইয়া সকলেরই খুব আনন্দ ইহাত লেখাই বাহুল্য। মা অনেকক্ষণ শিবের দরজায় বসিয়া যাহাদের প্রাইভেট ছিল সব সারিয়া উপরে নিজের শয়ন কক্ষে চলিয়া গেলেন।

২২।১০।৭৬

আজ কালী মাতার পূজা। মূর্তি কেনাপালই তৈয়া করিয়া গিয়াছিল দুর্গামূর্তির সঙ্গে। অতি সুন্দর মূর্তি। পূজা নির্বাণই করিল। ভোলাবাবা দলবল নিয়া আসিয়াছেন। ইনিও মাকে খুবই শ্রদ্ধা ভক্তি করেন। রমা চৌধুরী কলিকাতা রবীন্দ্র ভারতীর ভাইসচ্যান্সেলার। ইনি আজ মীরাবাইর সংস্কৃত লীলা দেখাইলেন। আগামী কল্য রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সংস্কৃত ভাষায় লীলা দেখাইবেন, আর দিল্লীরই রেডিওর গায়িকারা গান শুনাইল। কয়েকজন মেয়ে কালী কীর্তন করিল।

২২।১০।৭৬

গত তিন মাসের মধ্যে দিল্লী আশ্রমে তিন বার মায়ের শুভাগমন ঘটিল–জুলাই মাসে রামায়ণ নবাহ উপলক্ষে, সেপ্টেম্বর মাসে দুর্গোৎসব উপলক্ষে এবং অক্টোবর মাসে কালী পূজা

উপলক্ষে। মাতৃলীলার এই অধ্যায়ের প্রত্যক্ষদর্শী গঙ্গাসমীরণ। তাহার নাম রাখিয়াছি 'হাস্যবদন বিশ্বনাথ।' তাহাকে বলিলাম সে যদি মাতৃলীলার বিবরণ লিখিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে সেই রচনা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইবে। গঙ্গাসমীরণ হাস্যবদনে উত্তর দিল "দিদি! তোমার বইয়ের মধ্যে যদি আমার রচনাকে স্থান দাও, তাহা হইলে যে গুরু-চণ্ডালী-দোষ হইবে-তুমি তো গুরুপ্রিয়া, আর তোমার তুলনায় আমার আচরণ যে চণ্ডালবৎ।" আমি তাহাকে বলিলাম "আরে ভাই! তোমার রঙ্গ রাখ তো। তোমার ডায়েরী খানা দাও আমাকে।" সে সুবোধ বালকের মতো তাহার রচনা আমার হাতে দিয়া বলিল, "সর্বস্বত্ব দিদিকে দত্ত" গঙ্গা সমীরণের ডায়েরীর কিয়দংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

দিল্লীতে তুলসীরামায়ণ নবাহ—

"২৫।৭।৭৬ থেকে ৪।৮।৭৬ পর্যন্ত আমাদের দিল্লী আশ্রমে মাতৃসন্তানদের মাতৃ সঙ্গ সৌভাগ্য ঘটলো। উপলক্ষ–নাভার ভূতপূর্ব মহারাজা ও মহারাণীর সংকল্পিত তুলসী রামায়ণ নবাহ। নয়দিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানের নিয়মানুসারে দু জন পণ্ডিত মূল তুলসী রামায়ণ আদ্যোপান্ত পাঠ করলেন। তাঁরা বসতেন দিদিমার ঘরে। "হল্"–ঘরে ব্যাখ্যা করতেন কাশীর সুবিখ্যাত সন্ত ছোটে লালজী মহারাজ। তাঁর নির্দিষ্ট সময় ছিল–সকাল বেলা ১০টা থেকে ১১:৩০ এবং বিকাল বেলা ৪টা থেকে ৭টা। সুললিত তাঁর কণ্ঠস্বর এবং অপূর্ব তাঁর সাবলীল বাগ্মিতা। রামায়ণের প্রধান প্রধান চরিত্রগুলির বিশ্লেষণ করে, তিনি শ্রোতৃ মণ্ডলীকে অনুপম রস পরিবেশন করেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম, বিবাহ এবং রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান এবং প্রসাদ বিতরণ হয়েছিল। রামায়ণ নবাহে যাঁরা যোগদান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য–শ্রী ১০৮ গিরিধর নারায়ণ পুরীজী মহারাজ, শ্রী ১০৮ প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারীজী মহারাজ এবং শ্রী ১০৮ স্বামী বিদ্যানন্দজী মহারাজ।

ইতিমধ্যে একদিন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মায়ের সঙ্গে "প্রাইভেট" করেছিলেন এবং মায়ের স্নেহাশীর্বাদ লাভ করে ধন্য হয়েছিলেন।

রামায়ণ নবাহ যখন চলছে তারই মধ্যে ভীতি জনক সংবাদ পাওয়া গেল–মায়ের নাকি অত্যন্ত কঠিন পীড়া। ডাক্তারগণও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সকলের মনে নিদারুণ উদ্বেগ। "মা! তুমি কেমন আছ?"–এই প্রশ্ন করলে মা হাসি মুখে উত্তর দেন, "যেমন দেখছো!" মা বলেন রোগ–অতিথি নাকি মায়ের শরীরে কীর্তন করছে। মায়ের খেয়াল না হলে মায়ের অসুস্থতা দূর হবার কোন উপায় নেই। সৌভাগ্য ক্রমে নবাহ অনুষ্ঠানের উদ্যাপন দিবসে অপরাহ্নে অলৌকিক ভাবে মায়ের শরীর প্রায় স্বাভাবিক হয়ে গেল। সন্ধ্যাকালে মা শিব মন্দিরের সংলগ্ন বাগানে একটি চেয়ারে উপবেশন করলেন। আকাশ ঘন মেঘে সমাচ্ছন্ন। সন্তানগণ নীরবে শ্রেণীবদ্ধভাবে মাতৃদর্শন করছেন। দিবা ও রাত্রির সন্ধিক্ষণে প্রকৃতি দেবীর গুরু গম্ভীর পরিবেশ। মায়ের মুখে

একটি কথা নেই। কিন্তু মাকে দূর থেকে মনে হয়েছিল যেন স্বাস্থ্যের জ্যোতিতে মুখ মণ্ডল উদ্ভাসিত। অলৌকিক পরিবর্তন দেখে অবাক হয়ে গেলাম। সকাল বেলা দেখেছিলাম অন্য রকম মূর্তি—রুগ্ন, ক্লিষ্ট, পাণ্ডুর বিদায় কালে মা সন্তানগণের মনোবাঞ্ছ পূর্ণ করে প্রায় নিরাময় রূপ দর্শন করালেন। বিচিত্র মায়ের লীলা।"

দুর্গোৎসবে মাতৃসঙ্গ কণিকা—

"কনখল থেকে মা দিল্লীতে পৌঁছান ২২শে সেপ্টেম্বর। এবছর দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা এবং অন্নকূট দিল্লী আশ্রমে অনুষ্ঠিত হল।

মায়ের শরীর দুর্বল অপটু। তথাপি পূজামণ্ডপে মা যখন দীর্ঘকাল বসে থাকতেন, তখন মনে হত যেন ধ্যানের মন্ত্র রক্তমাংসের দেহ ধারণ করেছে—নবযৌবন-সম্পন্না, সর্বাভরণ ভূষিতা শ্রীলাবণ্য মণ্ডিতা দশভূজা যেন দ্বিভূজা মূর্তিতে প্রকাশিতা।

কখনো মাকে দেখা যেত শিবমন্দিরে, কখনো চণ্ডীপাঠের কোনো কেন্দ্রে, কখনো কুমারী পূজার স্থানে (কখনো বা দিদির কক্ষে- এই খবরটি অবশ্য প্রাইভেট!)

বিরাট প্যান্ডেলের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র ছিল মায়ের স্বচ্ছন্দ গতিবিধি। কোন কোন দিন মা ভোর বেলা ঘূর্ণা দিতেন বাগানের পথে পথে। প্রভাত সূর্যের প্রথম স্পর্শে অরুণিমা ফুটে উঠতো মায়ের স্নিগ্ধ সুন্দর বদন মণ্ডলে। প্রত্যূষে মা যখন মন্থর গতিতে পশ্চিম দিক থেকে উদীয়মান সূর্যের অভিমুখে অগ্রসর হতেন, দূর থেকে মাকে দেখে মনে হত যেন সঞ্চারিণী সৌদামিনী।"

"একদিন সান্ধ্য সৎসঙ্গে জনৈক ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, "মা! কৃষ্ণ, রাম, কালী, শংকর—তফাৎ কী?" ক্ষণমাত্র অপেক্ষা না করে মা হাসিমুখে উত্তর দিলেন "তুমি তো পুত্র, পিতা, পতি—তফাৎ কী?"

এই প্রশ্নের আড়ালে ফুটে উঠলো মায়ের মুখনিঃসৃত শাশ্বত তত্ত্ব "এক ব্রহ্ম, দ্বিতীয় নাস্তি।" প্রশ্নকর্তা হতবাক্। সমবেত সন্তানদের মনে এই মাতৃবাণী গভীর রেখাপাত করেছিল।"

"অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ত্রিপুরারি চক্রবর্তী মহাশয় রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, উপনিষদ, কালিদাস ও রবীন্দ্র সাহিত্য মন্থন করে কন্ঠস্থ করেছেন অগণিত মণিমুক্তা সেই অপরিমেয় সংগ্রহের অর্ঘ্যদান করে তিনি মাকে 'বাজিয়েছিলেন' সুষ্ঠু ভাবে। তাতে মায়ের লীলার 'পোষ্টাই' হয়েছিল। সেই লীলার স্ফুরণে সৎসঙ্গ হয়েছিল সার্থক। কোনও কোনও দিন তিনি নিজের ভাষণের পর মাকে বলতেন—"মা! তুমি কিছু বল। তোমার কথা সকলে শুনতে চায়। শুনে খুশী হয়।" যেদিন খেয়াল হয়, সেদিন মা সুন্দর সুন্দর কথা বলেন।"

"অধ্যাপক চক্রবর্তী মহাশয়ের ভাষণের বিষয়বস্তু ছিল—প্রার্থনার অমোঘ ফল। সেই সূত্রে

মা একটি কাহিনী বর্ণনা করলেন। এক দরিদ্র রমণী অর্থাভাবে তার ছেলেকে মনের মতন খাবার দিতে পারেনা বলে তাঁর চোখে জল। ছেলেটি তার মাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি করলে আমাদের দুঃখ ঘুচবে?" সরল বিশ্বাসে ছেলেটি একখানি কাগজ সংগ্রহ করে ভগবানের উদ্দেশ্যে চিঠি লিখে জানালো তাদের দুঃখের কথা এবং প্রার্থনা করল যেন দুঃখ মোচন হয়। চিঠি খানি নিয়ে সে ডাকবাক্সের কাছে গেল। কিন্তু ডাক বাক্স তার পক্ষে বড় উঁচু। বার বার ছেলেটি চিঠি খানিকে ডাক বাক্সে ফেলবার চেষ্টা করছে, আর' বার বার তা বাইরে পড়ে যাচ্ছে। অথচ চেষ্টার বিরতি নেই। এই দৃশ্য দেখে এক শেঠজীর কৌতূহল হল। তিনি ছেলেটির কাছে এসে, তার লেখা চিঠি খানি পড়লেন এবং তার নিষ্ঠা দেখে তাঁর মনে দয়ার উদ্রেক হল। তিনিই এ পরিবারের সংসার যাত্রার ব্যয়ভার বহন করলেন।"

"অধ্যাপক চক্রবর্তীর ভাষণের অপর একটি বিষয় ছিল–ভগবানে নির্ভরতা। সেই সূত্রেও মায়ের মুখ থেকে শোনা গেল একটি কাহিনী। এই গল্পের নায়ক একটি দুষ্টু ছেলে। এক ধোবা মাঠে কাচা কাপড় শুকাতে দিয়েছিল। ছেলেটি সেই কাপড়গুলি মাড়িয়ে অপরিষ্কার করে দিল। ধোবা তাকে ধমক দিল। তবুও ছেলেটির দুষ্টুমি বন্ধ হল না। তখন ধোবাটি লোকজন নিয়ে এসে ছেলেটিকে মারবার আয়োজন করল। ছেলেটি কাতর স্বরে ভগবানকে জানালো 'হে ভগবান! বাঁচাও।' সেই সময়ে ভগবান মধ্যাহ্ন ভোজনে রত। হঠাৎ আর্তজনের কাতর আহ্বান শুনে ভগবান আসন ত্যাগ করে উঠে পড়লেন। কিন্তু মুহূর্ত মধ্যেই তিনি আবার ফিরে আসলেন। রুক্মিণী দেবী জানতে চাইলেন "ব্যাপারটা কী?" শ্রী ভগবান বললেন, "ভক্তের ডাকে তাকে বাঁচাতে গেলাম। তাকে ধোবার হাত থেকে রক্ষা করে নিরাপদ স্থানে রাখলাম। বিপদ থেকে মুক্তি পাবার পরেই সেই দুষ্ট ছেলেটি নিরাপদ জায়গা থেকে ধোবার প্রতি নিক্ষেপ করবার জন্য পাথর কুড়াতে আরম্ভ করল। তাই আমি ভাবলাম– ও যখন নিজের ভার নিজেই নিচ্ছে, আমার আর প্রয়োজন কি? তাই চলে এলাম।"

উপাখ্যান দুটি সুবিদিত। কিন্তু মায়ের বর্ণনা অনুপম। ছাপার অক্ষরে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। মায়ের হাসি, মায়ের দৃষ্টি, মায়ের বলবার ভঙ্গীর আস্বাদন লাভ করা যায় মাতৃসঙ্গে থাকবার সৌভাগ্য ঘটলে। ছবির ফুলে সৌরভ থাকে না, পটের সূর্যে তেজ থাকে না।"

(ক্রমশঃ)

চিত্রা বন্ধুর ডায়েরী হতে উদ্ধৃত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

"এখন তুলা যজ্ঞের জন্যে ওরা এই শরীরকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে কতসের ঘি আনবে– "১৫সের ঘি আনা হোক বলা হয়– সেই কথানুযায়ী ওরা ঠিক ১৫ সের ঘি আনায়। সেই ঘি তখন আগুনের মতন গরম ছিল। এই শরীরের জন্যে দার্জিলিঙ থেকে একজন পাঁচসের ঘি নিজে তৈরী করিয়ে পাঠায়–এ ঘি ওরা তুলায় দিতে চায়নি– এখন খেয়াল হল যে সেই ঘি আনা হোক, অন্য ঘি তো আগুনের মতন গরম-ছোট শিশুকে তা দিয়ে ওজন করা সম্ভব নয়, ঐ পাঁচ সের ঘি ওরা দেবেনা—মার জন্যে তোলা থাক—সেই ঘি দেবার এমন ঝট করে খেয়াল চাপল যে তা আনতেই হল, তারপর সেই ঘি দিয়ে তুলে তুলে একদম বস্ত্র ও ঘি মিলিয়ে গোপালের সমান ওজন করা হল।"

"এরপর রুপার বাসন, তিল, বাসমতী চাল ও ঘি দিয়ে ওজন করা হল। জাগ্রত ঠাকুর কি না। মা বললেন, "তাই কখনো ১৫সের বা তার কমও হচ্ছিল।" বিশেষ করে ঘি মার কথানুয়ায়ী ঠিক ১৫সের আনা হয়েছিল– তখন আর কারুর খেয়াল হয়নি যে যদি একটু বেশী লাগে কী উপায় হবে, মা বলেছেন ১৫ সের ব্যস তা আনলেই হবে, মা বললেন, "পরে যখন ঘি চাপাচ্ছে তখন নারায়ণ আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছে।" যদি ১৫ সেরের বেশী হয় কী করা হবে- -কিন্তু ঘিয়ের বেলায় গোপাল ১৫ সের থেকে একটু কমই ওজন নিলেন।"

মার এসব লীলার মধ্যে আরেকটি জিনিষ খুব চোখে পড়ল তা হল মা যখন নিজের জলচৌকী থেকে বসা অবস্থা থেকে উঠলেন ঠিক গোপালের ভঙ্গীতে একটা হাত মাটিতে রেখে– পাটি সেই ভাবে ঠেঁকিয়ে যেন ভর দিয়ে উঠেছিলেন। তুলার সময় মা হঠাৎ বিভুদারা গোপালের নাম কীর্তন করছিলেন, তা নিজে হাত তালি দিয়ে দিয়ে করতে লাগলেন, ঘণ্টা খানেক মা অফুরন্ত নাম করলেন–"গোপাল জয়-গোবিন্দ জয়. গোপাল গোপাল ব্রহ্মগোপাল–ইত্যাদি। মা গোপালের তুলার সময় হিরুদাকে কী ভাবে চামর ব্যজন করতে হয় তা নিজে খানিকক্ষণ করে দেখিয়েছিলেন। তার পরে তুলা যজ্ঞ ১২টায় শেষ হতে মা স্বহস্তে প্রসাদ (বাতাসা) বিলি করলেন।

কন্যাপীঠের মেয়েরা আশ্রমের সমস্ত চাতাল ভর্তি করে নানা রকম শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা ও বৃন্দাবন লীলা সব সাজায়, মা রাতে তা পরিদর্শন করলেন। রাত ১১॥টায় বিশুপন্ডিত শসা

কেটে জন্মাষ্টমীর পূজো আরম্ভ করলেন। মা তখন স্থির হয়ে বসেছিলেন। পুষ্প, ছবি নাম করল। মা আমাকে একটা গান করতে বললেন। আমি কি করব ভাবতে ভাবতে যেই 'পরাণ কৃষ্ণ' গান ধরেছি অমনি আরতি আরম্ভ হবে বলে থেমে যাই। পরে ভাবছি যে খুব বাঁচিয়ে দিয়েছেন–জন্মাষ্টমীর appropriate গান জানিনা ওটা গাইতে আর হল না। ও মা! আরতি শেষ হতেই মা ফের দু তিন বার বললেন যে গান শোনাও–অগত্যা করলাম।

রাত ১॥ টায় পূজো শেষ হতে আমরা ফলাহার করে এলাম, মা দুটোয় আশ্রমে এলেন। তখনও দিদির বড়দির অহোরাত্র কীর্তন party খুব নাম চালাচ্ছে। অষ্টমীর চাঁদ উঠেছে–মা এসে কীর্তনের ওখানে যজ্ঞ মন্ডপের সামনের বেঞ্চীতে বসলেন। তখন চণ্ডীমণ্ডপে সাজানো মার জন্মোৎসবের সিংহাসনে বসতে মাকে বাচ্চুদার মা (বড়দি) অনুরোধ করতে মা খালি এড়িয়ে যান– "তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে–একটু উপরে এসে শোন মা–" বড়দি মাকে বলছেন। পরে তিনটে নাগাদ মা উপরে চলে যান–আমিও শুতে যাই। শুনলাম চারটে নাগাদ মা এসে মিনিট দুই সিংহাসনে বসেন।

৫টার সময় ঘুম চোখে নেমে এসে দেখি যে মা কীর্তনীয়াদের কাছে বসা, ঠিক ৫॥টায় কীর্তন শেষ হল। মাও ঘুরলেন কীর্তনীয়াদের সঙ্গে আমরাও ঘুরলাম।

তারপর গোপালজী ফের Procession করে ফিরলেন। আমরা সবাই তাঁকে স্পর্শ করলাম, ফের স্নান করে তিনি আশ্রমে বসবেন।

নন্দোৎসব ৩০শে আগস্ট—১৯৫৬

কাশীতে নন্দোৎসবের ঘটার কথা লোক মুখে খুব শুনেছি, মাতৃকৃপায় এবার তাতে যোগদান হয়ে গেল। কন্যাপীঠের হলে কৃষ্ণলীলা হয়ে গেলে নন্দোৎসব হবার কথা। মার খেয়ালে রাতারাতি মীরাবাঈ কিছুটা করাও হচ্ছে। সেদিন হঠাৎ মার কাছে ছবিদিও আমি দাঁড়িয়ে আছি– মা কিছুক্ষণ তাকিয়ে বলে উঠলেন "তোমার ভাব ও ছবির গান–ঠিক আছে মীরা তুমি কর।" আমি এত stunned যে হাঁ না করার আওয়াজও গলা দিয়ে বেড়াল না। মা খুব দুষ্ট দুষ্টু হাসি হেসে চলে গেলেন। একটু দূরে দাঁড়িয়ে আমি কার কাছে এই আকস্মিক বিপদের কথা বলছি–হঠাৎ মা সেইদিকে ছুটে এসে খুব গম্ভীর অথচ হাসি আসছে বোঝা যাচ্ছে এমন মুখ করে বললেন, "যাও যাও এখানে দাঁড়িয়ে আর কথা বলতে হবে না–যা-যা-করে ফেলো।"

রাতে আবার মা–যখন আমরা প্রণাম করতে গিয়েছি মা বলছেন, "কী তোমাদের কিরকম হচ্ছে? মা তখন আবার বললেন যে তিনটে মীরাও হতে পাবে–ছোট-মেজো ওবড়।

যাই হোক নন্দোৎসবের জন্যে কন্যাপীঠের hall প্রায় ভরে গেল। মা বলে রেখেছিলেন যে বারান্দা যেন খালি থাকে। মা এসে Green room এ ঢুকলেন। ভেতরে বুনিদি, বীথুদি, বুবা, সতীদি, গিনি ও ছবি। কীযে ব্যাপার খানিকটা আঁচ করতে পারলেও আমি সমস্তটা বুঝিনি। ভেবেছিলাম মা কিছু লীলা করবেন। মিনিট দশেক পরে দরজা খুলতেই মা stage অর্থাৎ একটু ঘেরা জায়গা ও কটা ফুলগাছ, সেখানে বেড়িয়ে এলেন। বুবা রাধিকা সেজে বসা, মা ব্লু chiffon এর শাড়ী পরে গায়ে বাঘের ছাল জড়ানো, মাথায় চুড়ো— orange satin দিয়ে বাঁধা–গলায় সেই জন্মোৎসবের সন্ন্যাসীর দেওয়া ১০০৮ লাল রঙের তুলসীর মালা- গলায়, হাতে, কানে রুপোর পাহাড়ী গয়না, পায়ে রুপোর পায়জোর, at first sight মাকে অপূর্ব দেখাচ্ছিল–কী যে দেখলাম বলা মুস্কিল–একবার মনে হল যেন এক পাশ্চাত্য মহিলা fur cape পরে ঢুকলেন–আবার মনে হল যেন স্বয়ং বিন্ধ্যবাসিনী বা কৈলাসেশ্বরী, কপালে ভস্ম মাখা–মুখ মণ্ডল থেকে কী জ্যোতিই বেরোচ্ছিল।

বেলুদি জন্মোৎসবের সময় স্বপ্নে বিন্ধ্যবাসিনী দেবীকে এই সাজে দেখে মাকে এরকম সাজায় তখন সবাই দেখতে পায়নি মায়ের সাজ তাই মেয়েরা জন্মাষ্টমীর রাত তিনটায় মার কাছে এই সাজ সাজার জন্য আর্জী পেশ করে। মা কিন্তু Idea বদলিয়ে নিজেকে যোগিনী ভাবে শ্রীকৃষ্ণলীলা করান। মা ঢুকেই আমরা যারা wing এর ধারে ছিলাম তাদের দিকে তাকিয়ে খুব হেসে নিয়ে ফের সামলে নিলেন। তারপর একটু ঘুরে ফিরে একটা শাঁখ নিয়ে ফুঁদিলেন–বলাই ছিলো মায়ের যে আমি মুখে ফুঁদেব তোরা ভেতর থেকে বাজাবি। এবারে মা গিয়ে বসলেন তখন বুবা কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো "যোগিনী তুমিকে? কোথাথেকে এসেছ?" মা বললেন– "আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে। আগে আমায় কিছু খেতে দাও।" ও মাকে সন্দেশ খাওয়াতে যেতেই মা চোখ বুজে ভাবস্থ হয়ে গেলেন। পাছে মার যোগিনীভাব সত্য সত্য এসে যায় বীথুদিরা মাকে তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করতে লাগলো "যোগিনী তুম কোন হো?" বলতে বলতে ওরা নিজেরাই "আরে এ যে আমাদের মা" বলে উঠলো, মা তখন খুব হেসে উঠলেন ও তাড়াতাড়ি সর্বপ্রথম কানের পাহাড়ী রুপোর ঝুমকা দুল খুলে ফেললেন। আমি ছবি নেবার তালে ছিলাম। কিন্তু বুবা সামনে এমন ভাবে দাড়িয়েছিল যে সুবিধে করতে পারিনি ও পরে বলল যে মা নাকি ওকে বলেছিল– "এই তুই সামনে দাঁড়া ছবি তুলতে দিসনি।"

এসবের পরে মা কাপড় ছেড়ে বসতে ওরা মাকে আরতি করলো। তারপর মা দর্শক হয়ে বসলেন। কয়েকজন বয়স্কা মহিলাদের মা গোপিনী সেজে রঙ্গীন কাপড় এক একটা পরে ঘড়া

নিয়ে stage এ দাঁড়াতে বললেন। আবার হঠাৎ রেণু মাসী শান্তিমাসী ইত্যাদি কয়েকজনকে stage এর একপাশে দাঁড়িয়ে লীলা দেখতে বললেন গোপিনী দর্শক হিসাবে। সরযূদি ও অরুণাদি নন্দবাবা ও যশোদামায়ী সেজে একটু দাঁড়াতেই সবাই হেসে গড়াগড়ি।

মা এরপর হঠাৎ ফের উঠে এসে stage এর একটি ধারে বসে মীরাবাঈ দেখলেন। মা স্বয়ং কাছে থাকাতে আমরা কোন practise ছাড়া বেশ স্বাভাবিকভাবে মীরার part করলাম। মার কৃপাতে মীরার ভাবটিও সাময়িক আমাদের মধ্যে এসে গিয়েছিল ছবিদি বৃন্দাবনের পথে মীরা সেজেছিল–মিত্তির-বুবার ছোটবোন ছোট মীরা হয়। চিত্রা মেজো বয়সের মীরা।

মীরাবাঈ শেষ হতেই নন্দোৎসব আরম্ভ হল। বুবা হারমোনিয়াম গলায় ঝুলিয়ে ফেলল। মার হাতে সেই Spear shape assemblage of খঞ্জনী (নাম জানিনা বাজনাটার) মা প্রথমে ঘুরে ঘুরে hall এই গান করছিলেন। তারপর বারান্দা Cross করে নীচে নেমে এলেন চাতালে, ও যজ্ঞমণ্ডপের চারিধারে ঘুরে ঘুরে নাম করতে করতে কখনো কারুর হাত ধরছেন কখনও কাউকে ডান হাত ও বাঁ হাত দিয়ে বুকে টেনে নিচ্ছেন। ছেলেরা সবাই দূর থেকে দেখছিল। মেয়েদের নিয়েই মায়ের কীর্তন হচ্ছিল। এবার মা সেবালয়ের (কমলদার office) বারান্দায় উঠে পড়লেন ও "ধর লউ ধর লউ" আরম্ভ করলেন। সে কী জোর নাম করা– মা নিজে একবার ডান হাতছানি একবার বাঁ হাতছানি দিয়ে ডানদিকে বাঁদিকে যারা দর্শক তাদের "নিতাই ডাকে আয়– গৌর ডাকে আয়' বলে অপরূপ মুখ ভঙ্গিমা করে ডাকছেন। স্বয়ং গৌর হরি যেন পুনরায় নদিয়ায় আবির্ভূত হয়েছেন।

হঠাৎ মা বুবার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, "তোরা যে যত চায় সে তত পায় বলবি" আর আমি "নাম-প্রেম বলবো।" আমরা "যে যত চায় সে তত পায়" বলছি আর মা উচ্চৈশ্বরে ডান হাত তুলে "নাম" – "প্রেম" বলছেন– সে কী যে আনন্দ যেন সত্যি শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায় অবস্থা। তারপর ক্ষমাদি দইয়ের ভাঁড় আনলো। আমি মার থেকে দূরে ছিলাম কিন্তু করুণাময়ী হঠাৎ ইসারা করে ডেকে নিলেন কাছে। দইএর ভাঁড় ধরেছি– মা এক খাবলা করে দই নিয়ে সবাইকে হাঁ করতে বলছেনও মুখের ভেতর ও মাঝে মাঝে দুষ্টুমী করে এক এক খাবলা বাইরে ও ছিঁটিয়ে দিচ্ছেন। ক্ষমাদি বলল, "মাকে একটু খাইয়ে দাও।" মাকে একটু দই খাইয়ে দিলাম।

প্রতি লোকের হাতে, মুখের ভেতর বা মাথায় মা দই দিলেন যেন অন্নপূর্ণা হয়ে প্রত্যেকের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মিটিয়ে দিলেন ক্ষণিকের জন্য। আবার মা বলছেন, "দই নিয়ে ছোড়াছুঁড়িতেই

তো নন্দোৎসবের মজা। যারা ভয়ে আসছেনা তাদের নাম করে করে ডেকে পাঠাচ্ছেন ও এক এক খাবলা চোখে মুখে ছুঁড়ছেন। নারায়ণ স্বামীজীর সংযম তাই ওঁর মুখে একটু ছিঁটিয়ে কপালে ফোঁটা দিয়ে দিলেন।

এবার মা চণ্ডী মন্ডপের সামনে যেখানে অহোরাত্র কীর্তন হয়েছে সেই চাতালে একটু দই ফেলে হঠাৎ শুয়ে চুল খুলে তাতে ডান দিকে ও বাম দিকে একটু গড়িয়েই উঠে পড়লেন। পরে বলেছিলেন "ভক্তের পদধূলিতে একটু গড়িয়ে নিলাম। বরাবর যে এদিনে এইশরীর স্নান নেয় তবে এবার বড্ড বেশী গায়ে ব্যথা তাই বেশী নন্দোৎসবে দই মাখামাখি করা হলো না।"

(ক্রমশঃ)

জীবন দর্শন

"ম্যায়সন" বলেছেন যে যেমন সোনার প্রতিটি কণা মূল্যবান, তেমনই সময়ের প্রতিটি ক্ষণই মূল্যবান তাই সময়ের সদুপযোগই হল সময়ের সুরক্ষা। সুতরাং যে, সময়ের সংরক্ষণ করে অর্থাৎ সময়ের সদুপযোগ করে সফলতা স্বয়ং এসে তাঁর পদচুম্বন করে। ডাঃ ভীমরাও আম্বেডকর লন্ডনে পড়াশুনো করছিলেন। তিনি শিক্ষার প্রতি সমর্পিত ছিলেন। যখনই সময় পেতেন তিনি অধ্যয়নে নিমগ্ন হতেন। লন্ডনে তাঁর সহপাঠী ছিলেন শ্রী আস্নাডেকর। তাঁরা দুজনে একটি ঘরেই থাকতেন। সব সময়ে অধ্যয়নে, নিমগ্ন আম্বেডকরকে দেখে আস্নাডেকর আশ্চর্যান্বিত হতেন। একদিন মাঝরাতে হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। তিনি দেখেন যে বাতি জ্বলছে আর ভীমরাও অধ্যয়নে রত রয়েছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি আর কতক্ষণ পড়াশুনো করবে? অনেক ক্ষণ হয়ে গেচ্ছে। এখন শুয়ে পড়।" আম্বেডকর উত্তর দিলেন, "আস্নাডেকর সাহেব, আমার খাওয়ার পয়সা ও ঘুমের সময় কোথায়? আমায় তো সময়ের প্রতিটি ক্ষণেরই সদুপযোগ করতে হবে। সময় নষ্ট করার মত আমার অবস্থা নয়।" এই বলে তিনি আবার অধ্যয়নে মগ্ন হলেন।

(দৈনিক ভাস্কর পত্রিকা হতে উদ্ধৃত)

সদ্‌গুরু কে

—ব্রহ্মচারিণা গুণীতা

(হিন্দীহতে রূপান্তর – ব্রঃ গীতা)

সদ্‌গুরু কে? যিনি এই কথা বলতে সমর্থ হন–"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ:॥" (শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা-অ-১৮) সব প্রকারের ধর্ম, যার অন্তর্গত অধর্মও এসে যায় তাই বলা হয়েছে "সকল ধর্ম ও অধর্মের চিন্তা ছেড়ে তুমি আমার শরণে এসো। বৎস এতটুকুই কর। আমি তোমায় সব পাপ হতে মুক্ত করে দেব। শোক কোরো না।" সংসাররূপী চক্রব্যূহে আবদ্ধ জীব মাত্রের জন্য শ্রী ভগবানের এই বাণী অমৃতধারাতুল্য। শুধু অমৃতধারাই নয় বরং একটি পরম আশ্রয়। নিমজ্জমান জাহাজকে যেমন দিক্ নির্দেশ করার জন্য সমুদ্রের আলোক স্তম্ভ হয়, তেমনই ভবসাগরে নিমজ্জমান জীবন-তরণীকে পথ দেখাবার জন্য শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার এই দিব্য জ্ঞানালোক স্তম্ভ জাজ্বল্যমান হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। যা শুধু একমাত্র শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর এই দিব্য বাণীতে আমরা শুনতে পাই সেই চরম পরম সত্য, "জেনে রেখো গুরু বলতে একমাত্র স্বয়ং একই।"

সদ্‌গুরু তিনিই যিনি বলতে পারেন– "মা আছেন– কিসের চিন্তা? মাত্র একটিবার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধায় প্রাণ পূর্ণ করে যে বলতে পারবে– "মাগো! তুমি এসো, তোমাকে ছাড়া দিন আর আমার চলে না"– তবে সত্য সত্যই মা নিজ স্বরূপে তাকে দেখা দেবেন, তাঁর স্নেহময় অঙ্কে তাকে তুলে নেবেন। দুঃখের তাড়নায় ক্ষণিকের জন্য তাঁকে কোন রহস্যময়ী আশ্রয় ভেবো না। মনে রেখো–তিনি অনুক্ষণ তোমার অতি নিকটে প্রাণ শক্তির মত বিদ্যমান আছেন। তাহলে তোমার আর কিছুই করতে হবে না। তিনি তোমার সকল ভার নেবেন।" সদ্‌গুরু মাতৃস্বরূপা শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর সান্নিধ্য প্রাপ্ত জীবাত্মাদের জন্যই দীন দুনিয়ার এই উবড় খাবড় রাস্তা পার করার জন্য এবং যা কখনও ভাঙবার নয় এমন অটুট দৃঢ় সেতু স্বরূপ হল শ্রীশ্রী মায়ের এই উপর্যুক্ত বাণী। যারা শুধু শ্রীশ্রী মায়ের দর্শন মাত্র পেয়েছেন তাঁদের অন্ধকূপসম ভয়াবহ সংসারের সর্পিল পিচ্ছল মার্গে গমনের সময় মায়ের অমৃতবর্ষী এই শব্দ "আমি তো তোমাদের ছেড়ে যাইনা। আমি তো তোমাদের কাছেই আছি।" তাঁদের নির্ভয় হয়ে ভবসাগর পার করার প্রেরণা দিয়ে থাকে। এই হল সদ্‌গুরুর মহিমা। সদ্‌গুরুর স্বরূপ বর্ণন শ্রীশ্রী মায়ের বাণীতে এইরূপ পাওয়া যায়। শ্রীশ্রী মা বলেন– "গুরু ভিতর হতেই হয়। আসল খোঁজ এলেই প্রকাশ। বিনা প্রকাশ ছাড়া যে থাকাই যায়না। তিনি স্বয়ং গুরু রূপে এসে নিজেই নিজে প্রকাশ করে দেন বা প্রকাশিত হয়ে যান।"

শ্রীরাম চরিত মানসের বালকাণ্ডের আরম্ভ হয় গুরু বন্দনা দ্বারা–

"বন্দউঁ গুরুপদ পদুম পরাগা। সুরুচি সুবাস সরস অনুরাগা॥
অমিয় মূরিময় চূরণ চারু। সমন সকল ভবরুজ পরিবারু॥
সুকৃতি সম্ভু তন বিমল বিভূতী। মঞ্জুল মঙ্গল মোদ প্রসূতী॥
জন মন মঞ্জু মুকুরমলহরনী। কিয়ে তিলক গুনগনবসকরণী॥
শ্রীগুরপদনখ মনি গন জোতী। সুমিরত দিব্যদৃষ্টি হিয়ঁ হোতী॥
দলন মোহতম সোসপ্রকাসূ। বড়েভাগ উর আবই জাসূ॥
উঘরহি বিমল বিলোচন হীকে। মিটহি দোষভবরজনীকে॥"

অর্থাৎ তুলসীদাসজী বলছেন– "আমি শ্রীগুরু মহারাজের চরণ-কমলের পবিত্র রজের বন্দনা করছি। যা সুরুচি, স্বাদিষ্ট, সুগন্ধযুক্ত ও অনুরাগরূপী রসে পরিপূর্ণ। তা অমরমূল (সঞ্জীবনী জড়ী) বূঁটির সুন্দর চূর্ণ, যা সম্পূর্ণ ভবরোগের পরিবারকে নাশ করে দেয়। সেই রজধূলি সুকৃতি (পুণ্যবান পুরুষ) রূপী শিবের শ্রী অঙ্গে সুশোভিত নির্মল বিভূতি আর সুন্দর, কল্যাণ ও আনন্দের জননী। ভক্তের মনরূপী দর্পণের মলহারিণী ও তিলকধারণ করলে পর সেই রজের দ্বারা ভক্তের গুণ সমূহকে বশীভূত করে রাখে। অর্থাৎ অহঙ্কার হতে দেয়না। শ্রীগুরুমহারাজের চরণ-নখের জ্যোতি মণি মুক্তার প্রকাশসম, যার স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গেই হৃদয়ে দিব্য দৃষ্টির উদয় হয়। সেই প্রকাশ অজ্ঞানরূপী অন্ধকারকে নাশ করে থাকে, সেই প্রকাশ যার হৃদয়ে আবির্ভূত হয়, সে বড় ভাগ্যবান। তাঁর হৃদয়ে আবির্ভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হৃদয়ের নির্মল নেত্র উন্মীলিত হয় এবং সংসার রূপী রাত্রির দোষ দুঃখ মিটে যায়।"

সদ্‌গুরুর মহিমা অপার। গুরু বিনা কোনও কার্য সিদ্ধি হয় না। তাই শ্রীরামচরিত্র বর্ণন করার পূর্বে তুলসীদাসজী গুরু বন্দনা করেছেন ও গুরুস্মরণের দ্বারা তিনি অতল সমুদ্রের সমান গহন শ্রীরামচন্দ্রের জীবন গাথা অনায়াসে লিপিবদ্ধ করে চিরকালের জন্য অমর হয়ে গেছেন। এমনই হল সদ্‌গুরু পরমেশ্বরের মহতী কৃপা। একবার যদি তিনি কৃপা করে নিজেকে ধরা দেন তো মানুষের এক জন্ম কেন? আগে পিছে সকল জন্ম জন্মান্তরের উদ্ধার হয়ে যায়। এই কথাই তুলসীদাসজী উপর্যুক্ত পংক্তিতে স্পষ্ট করে বলেছেন–

"দলন মোহতম সোসপ্রকাসূ। বড়ে ভাগ উর আবই জাসূ॥
উঘরহিঁ বিমল বিলোচন হীকে। মিটহিদোষ ভব রজনীকে॥"

শ্রীশ্রী মায়ের বাণী শ্রীগুরু মহিমাকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলছেন,– "ভগবৎ প্রাপ্তির রাস্তা সরল সহজ। গুরু যা বলেন তাই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র। ঠিক ঠিক গুরুমন্ত্র জপ করলে প্রকাশ ছাড়া হতেই পারেনা।" মা বলছেন, "গুরুশক্তি প্রকাশ হলে, ফল হবে না? আগুনে প্রবেশ করলে জ্বলবেই।"

শিখ সম্প্রদায়ে গুরুদের বাণীকেই সদ্গুরু রূপে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। শ্রীশ্রী মায়ের একটি বাণী রয়েছে, যেখানে মা বলছেন, "সদুপদেশ, শাস্ত্রউপদেশ যেখানে যতটা লেখারূপে, অনুভবরূপে, গ্রন্থরূপে গ্রন্থিভেদনের জন্য প্রকাশ-তাকেই তো গুরুগ্রন্থ বলে। ঐখানে গুরুই গ্রন্থরূপে প্রকাশ।"

বাবা নানকদেব গুরু প্রেমীদের আশ্বাসন দিয়ে বলছেন, "থির ঘর বসুহঁ হরিজন প্যারে। সদ্গুরু তুমরে কাজ সঁবারে॥ দুষ্ট দূত পরমেশ্বর মারে জন কী পৈজ, রখী করতারে॥" নানকদেবজী গুরুর মহিমাকে অপরম্পার বলেছেন। তিনি আর এক "শব্দ" কীর্তন করেছেন– যা অতিশয় হৃদয় গ্রাহী "সদ্গুরু মেরে নাল হ্যায়। জিখে কিখে ম্যানু লে ছড়াঈ।" অর্থাৎ আমার সদ্গুরু আমার সঙ্গে রয়েছেন, তিনি আমাকে যেখান সেখান হতে ছাড়িয়ে নেন। অর্থাৎ মুক্ত করেন। সদ্গুরুর মহিমা শব্দের দ্বারা বর্ণন সাধ্য নয়।

শ্রীশ্রী মায়ের বাণী মানব জাতির জন্য বিশেষরূপে উদ্ঘোষিত হয়েছে, "মনুষ্য জন্ম দুর্লভ। মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য নিজকে জানা নিজকে পাওয়া।" বিনা সদ্গুরু তে এইটি সম্ভব নয়। শ্রীশ্রীমা বলছেন, "নিজে শিষ্যহতে চেষ্টা করো, তবেই গুরু মিলবে, কৃপাপাওয়ার দিক খুলবে করুণা ধারার সন্ধান মিলবে। প্রার্থী হলেই জিনিস মিলবার সম্ভাবনা। প্রার্থী তো হও।"

সদ্গুরুর আবশ্যকতা কেন হয়? মায়ের বাণী বলছেন, "এই কন্টকাকীর্ণ পথেও গুরু সর্বদাই হাত ধরে তাঁর দিকে নিচ্ছেন– এই সত্য মনে রাখা। কখনও আলেয়ার আলো মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তিনিই সর্বরূপে। যে গতিতে সর্ব-অবাধ রূপটি প্রকাশ হয়। সেই গতিতে স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার চেষ্টা, সর্বক্ষণ যথা শক্তি করা।"

"গুরু চাওয়া রূপে যিনি, প্রকাশ পাওয়া রূপেও তিনিই। কিন্তু সাচ্চা চাওয়া আসা প্রয়োজন। সর্বক্ষণ তাঁকে স্মরণ তাঁরই অনুভূতির জন্য।"

"গুরু-কৃপা যেখানে অনুভব–সেখানে আর কি চাই? গুরু-কৃপাই নিজ ইচ্ছা পূর্ণ করে। গুরুর উপদেশ ঠিক ঠিক মত পালন করা।" শ্রীশ্রী মায়ের এই বচনামৃত সমূহে সদ্গুরুর আবশ্যকতা এবং তাঁর অপার করুণার পরিচয় পাওয়া যায়। মানবজন্ম সফল করার জন্য সদ্গুরুর আবশ্যকতা রয়েছে। মাতা, পিতা, গুরুজনও সদ্গুরুর ভূমিকা নির্বাহ করতে পারেন। আবশ্যকতা হচ্ছে অন্তর হতে তাঁকে চাওয়ার। গুরুপূর্ণিমার এই পবিত্র অবসরে শ্রীশ্রী মায়ের বাণী বিশ্বমানবতাকে শান্তি, আনন্দ ও প্রেমের রাস্তা দেখিয়ে শঙ্খ নিনাদে ঘোষিত করছেন-

"স্বয়ং ভগবানই গুরুরূপে প্রকাশ হন। বিশ্বাস করো তাঁকে ডাকো।"

জয় মা।

তপোভূমি দর্শন

ডঃ সুচরিতা ঘোষ

২০শে ফেব্রুয়ারী ভোরে ঘুম ভাঙল আশ্রমের ছেলেদের তারকব্রহ্মনাম শুনতে শুনতে। আজ আমরা এখান থেকে রওনা হব। প্রথমে ইন্দোরে মায়ের আশ্রমে যাব। ওখান থেকেই আজ শিপ্রা এক্সপ্রেস ধরে বাড়ির দিকে রওনা হব। ছেলেদের আশ্রম পরিক্রমার সাথে নর্মদা মাঈয়ার আরতি, বিভিন্ন মন্দিরে আরতি ও কীর্ত্তন শুনতে শুনতে নিজেরা তৈরী হতে লাগলাম। কীর্ত্তন শেষ হওয়ার পর ছেলেদের সাথে আমাদের অনেকে আশ্রম পরিষ্কারের কাজে হাত লাগাল। আশ্রমের নিজস্ব নৌকা আছে। কোন কাজে কোথাও গেছে। জলখাবার খেয়ে জিনিষপত্র বাঁধাবাঁধি করে আমরা নৌকার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আশ্রমে খাবার দেখলাম বহু পদের নয় কিন্তু পুষ্টিকর খাদ্য। দুপুরের বা রাত্রের খাবার ভাত বা রুটির সাথে ডাল, একটা তরকারি একটু আচার। সকালে জলখাবারে কোনদিন ডালিয়া কোনদিন রাজমা ইত্যাদি। সকলে পেটভরে খাচ্ছে। স্বাস্থ্যও সকলের সুন্দর। এরা যাই করছে সকলে সদা আনন্দে, হাসিমুখেই করছে। গতকাল একটা খবর এসেছে, ভীমপুরা আশ্রমে স্বামী ভাস্করানন্দজীর শরীর তেমন ভাল নয়। খবর পেয়ে কেদারবাবা ঠিক করেছেন আজই ইন্দোর হয়ে ভীমপুরা যাবেন ভাস্করানন্দজী মহারাজের সঙ্গে দেখা করার জন্যে। সাড়ে আটটা নাগাদ নৌকা এল। যথারীতি আশ্রমের ছেলেরাই সমস্ত মালপত্র নামিয়ে নৌকায় গুছিয়ে তুলে দিয়ে গেল। আমাদেরও যত্ন করে বসিয়ে দিল। স্কুলের অনেক ছেলে মেয়েরা আমাদের চলে যাবার সময় ঘাটের কাছে এসে জড় হয়েছিল। সকলের কি আন্তরিক ব্যবহার। বার বার করে হাত ধরে আমাদের সকলকে বলছে আবার যেন আমরা আসি। নৌকা ছাড়ল। ওপর দিকে তাকিয়ে দেখি আশ্রমের বিভিন্ন তলায় অনেকেই হাত নাড়ছেন। ধীরেধীরে মায়ের আশ্রম, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, ওঁকারনাথজীর আশ্রম সব ছাড়িয়ে নদীর উল্টোদিকে একটা বিরাট আশ্রমের সুন্দর পাথরে বাঁধানো ঘাটে আমাদের নৌকা এসে থামল। পাড় থেকে উঠে সামনের রাস্তায় দেখলাম আমাদের জন্যে একটা বড় গাড়ী ঠিক করা আছে। মালপত্র নিয়ে সকলে আমরা গাড়ীতে উঠলে, গাড়ী ছাড়ল। পাহাড়ী পথের চারদিকের সুন্দর দৃশ্য দেখতে দেখতে আসার সময়ে যে নবগ্রহ মন্দির দর্শন করেছিলাম তার পাশ দিয়ে এগিয়ে ঘণ্টা দুয়ের মধ্যে শ্রীমায়ের ইন্দোর আশ্রমে পৌঁছলাম। ঢুকেই দেখি সামনে শ্রীমায়ের ভুবনভোলানো হাসি হাসি এক বিরাট

প্রতিকৃতি, গলায় গোলাপের মালা। কি সুন্দর লাগল। পিছনে শিব মন্দির। যজ্ঞের কুণ্ডও আছে। খানিক বাদে কেদারনাথজী মহারাজও এসে পৌঁছালেন। আমাদের কিছু মালপত্র ওঙ্কারেশ্বরের যাওয়ার পথে এখানে রাখা ছিল। দোতলার ওপরে যে ঘরে ওগুলি ছিল সেটি ও আরও কয়েকটি ঘর তাঁরা খুলে দিলেন থাকার জন্যে। বিরাট আশ্রম। শ্রীমায়ের মন্দির, ত্রিপুরেশ্বরী কালীমায়ের মন্দির, শিবজীর মন্দির, গোশালা, চিকিৎসালয়, বিরাট সৎসঙ্গ ভবন। ভক্তদের থাকার জন্যে প্রচুর ঘর। সব মিলিয়ে বিরাট ব্যবস্থাপনা। দুপুরে মন্দিরে ভোগ আরতির পর আমাদের খাবার ডাক পড়ল। এখানেও ওঙ্কারেশ্বরের মত একই রকম ব্যবস্থা। খুব আনন্দে প্রসাদ গ্রহণ করে আমরা একটু বিশ্রাম নিলাম. আজই আমাদের রাত্রি এগারটায় ট্রেন। সন্ধ্যা বেলায় আশ্রমের কীর্ত্তন ও সৎসঙ্গে উপস্থিত থাকব। তার মাঝে একটু সময় আমরা ইন্দোর শহরটা দেখে নেবার জন্যে ও টুকিটাকি কেনাকাটির জন্যে বিকাল সাড়েচারটের সময়ে আমাদের গাড়ীতে শহরের দিকে রওনা হলাম। বেরনোর ঠিক আগে শুনলাম কেদারবাবা নিচের ঘরে বসে আছেন। আমরা সকলে গিয়ে দর্শন ও প্রণাম করলাম। তিনি সকলের হাতে শ্রীমায়ের একটি করে ফটো ও একটি করে বই দিলেন। খানিক্ষণ বসে ওনাকে প্রণাম করে আমরা গাড়ীতে এসে উঠলাম। এ গাড়ী ওঙ্কারেশ্বরের থেকে ঠিক করা হয়েছে। আমাদের সঙ্গেই গাড়ীটা থাকবে ও রাত্রে আমাদের স্টেশনে পৌঁছে গাড়ী ওঙ্কারেশ্বর ফিরে যাবে। প্রথমে আমরা গীতা মন্দির ও পরে শহরের এদিক ওদিক কিছুটা দেখে অল্প কিছু কেনাকাটি করে সাতটার মধ্যে, সন্ধ্যারতির আগে আশ্রমে ফিরে এলাম। এখানেও সুন্দর সৎসঙ্গ হল। মায়ের বই থেকে পাঠ করলেন সীমাদির মা। সীমাদি নিজে ডাক্তার। এখন বাইরের প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়ে আশ্রমের সেবায় নিযুক্ত আছেন। সৎসঙ্গে সমবেতভাবে নর্মদা স্তোত্র, ভজন সবই হল। নটায়, পনের মিনিট মৌনের সাথে সন্ধ্যার সৎসঙ্গ শেষ হল। আমরা সোজা খাবার ঘরে চলে এলাম। এরপর দশটার মধ্যেই স্টেশনে পৌঁছাতে হবে। প্রসাদ নেবার পর আমরা আবার মালপত্র নিয়ে গাড়ীতে উঠলাম। হালদারদা ও রুবিদি আরও তিনদিন এই আশ্রমেই থাকবেন। ওঁরা 'জয় মা' বলে আমাদের বিদায় জানালেন। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা স্টেশনে পৌঁছালাম। আমাদের ট্রেন একটু দেরিতে এল। জয়ভাই ও প্রশান্তভাই কুলিকে দিয়ে ট্রলিতে করে মালপত্র কামরার সামনে নিয়ে গিয়ে উঠিয়ে দিলেন। নিজের জায়গায় আরামে বসে যে যার মোবাইলে বাড়ীর লোককে জানিয়ে দিল যে সকলে ফেরার ট্রেনে উঠেছি। জিনিষপত্র গুছিয়ে বিছানা করে আমরা শুয়ে পড়লাম। শুয়ে আছি, চোখে ঘুম নেই। মন ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে গত কদিনের আশ্রমের মুক্ত,

পবিত্র পরিবেশে, তীর্থের মন্দিরে মন্দিরে, কখনও নর্মদা ও কাবেরীর তীরে। ভাবতে ভাবতে আনন্দের আবেশ নিয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি।

২১শে ফেব্রুয়ারী আজ ভোরে ওঠার কোন তাড়া নেই। সারা দিন ট্রেনেই থাকতে হবে। তবু ভোরেই জয়ভাই ঘুম ভাঙালো চায়ের ফ্লাস্ক হাতে করে নিয়ে। এক এক করে সবাই উঠলো। মুখ ধুয়ে যে যার মত তৈরী হচ্ছি, আবিষ্কার করা গেল যে এই ট্রেনের সঙ্গে কোন প্যান্ট্রি কার নেই আর আনন্দের ওপর আরও আনন্দ যে সেই সময়ে রেল কতৃপক্ষের সঙ্গে আপস বনিবনা না হওয়ার কারণে স্টেশনের সমস্ত খাবারের স্টল মালিকরা কোন খাবার বিক্রি করছেন না। এমনকি স্টেশনে কলা পেয়ারা আপেলের মত ফলও পাওয়া যাচ্ছে না। আমাদের ভাগ্য ভাল যে সকলের সঙ্গেই উদ্বৃত্ত কিছু মুড়ি, চানাচুর, চিঁড়ে, বিস্কুট ইত্যাদি কিছু কিছু পড়েছিল। সকালে ত মুড়ি, চানাচুর বিস্কুট দিয়ে জলখাবার হল। দুপুরেও ঐ একই ভাবে চিঁড়ে ভাজা, বিস্কুট ইত্যাদি তার সঙ্গে একটা স্টেশন থেকে প্যাকেটে করা লস্যি পাওয়া গেল। সন্ধ্যায় আমাদের যথারীতি নাম গান ও সৎসঙ্গ হল। এর মধ্যে রাত্রের খাবার কথা চিন্তা করে অনেক খুঁজে একটা স্টেশন থেকে কয়েকটা পাউরুটি আর মাখন পাওয়া গেল। তাই দিয়ে রাতের খাওয়া সারা হল। এলেমেলো খাওয়া হচ্ছে। গৌরীর মেয়ে খুব স্বাদু ভাল একটা হজমি গুলির শিশি মায়ের সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল। প্রতিবার খাওয়ার পর সকলে সেটা চেয়ে একটু করে খেয়ে নিচ্ছে। এরপর প্রশান্তভাই সকলের বিছানা ঠিক ঠাক করে দেওয়ার পর আমরা সকলে কি দেখে এসেছি, কে কতটা লিখে রাখতে পেরেছি নিয়ে আলোচনা করছিলাম। দেখলাম শরীর ভাল না থাকার কারণে কিছু কিছু লিখে রাখতে ভুল হয়েছে প্রশান্তভাইকে জিজ্ঞেস করাতে ও পর পর বলতে লাগল। ওর দেখা দেখি সকলেই তাদের অভিজ্ঞতার কথা বলতে এবং লিখে রাখতে লাগল। একটা কথা-লিলিদির প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে বলি যে এবারের লেখাটার যে অংশ লিখতে ভুলে গেছি বা যে দু এক জায়গায় আমি যেতে পারিনি সেখানকার বর্ণনা আদি লিলিদির অনুমতি নিয়ে তাঁর লেখা থেকে সংগ্রহ করে লিখেছি। লিলিদির লেখাটিও খুব সুন্দর হয়েছে। ওতে প্রাণের ছোঁয়া আছে হাসি গল্প করতে করতে অনেক রাত হয়ে গেছে। পাশের কেবিন থেকে একজন এসে বলে গেলেন আমরা এবার যেন একটু আস্তে কথা বলি। নিজেদেরই লজ্জা লাগল। আনন্দের ঘোরে পরিস্থিতিও বিস্মৃত হয়েছি। সত্যি কদিন কি এক অনাবিল আনন্দের আবহে কাটালাম। এবার বাস্তবের মধ্যে ফিরে এলাম। কাল থেকে আবার গতানুগতিকতার মধ্যে চলাটা বলাটা সীমিত হয়ে যাবে। আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম।

২২শে ফেব্রুয়ারী মোবাইলের আওয়াজে ঘুম ভাঙলো। বাড়ীর লোকেদের ফোন আসছে। ওরা সকলেই জানতে চায় আমরা হাওড়া থেকে আর কতটা দূরে। ট্রেন দু ঘন্টা লেটে সকাল সাড়ে আটটায় হাওড়া স্টেশনে ঢুকল। ট্রেনেতেই ঠিক করে নেওয়া হয়েছিল যে দুটো ট্যাক্সিতে জয়ভাই ও প্রশান্তভাই আমাদের যে যার বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে যাবেন। বাড়ী পৌঁছলাম সকাল তখন সাড়ে দশটা। সব থেকে আনন্দের বিষয় এই যে যাবার সময় যে অবস্থায় গেছিলাম ফেরার সময় অবস্থা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। শরীর এখন সুস্থ, মন প্রাণ আনন্দে ভরপুর। শ্রীশ্রীমায়ের রাতুল চরণে বার বার শত শত কোটি প্রণাম। ভবনের ভাই বোনেদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা এবং সর্বোপরি শ্রীমায়ের কৃপাতেই এই দুর্বল শরীর নিয়ে আমি গিরি লঙ্ঘন করে হৃদয় আনন্দে ভরপুর করে ফিরে আসতে পারলাম।

"ত্বদন্যো বরেণ্যো ন মান্যো ন গণ্যঃ" *

ব্রঃ গুণীতা

(হিন্দী হতে রূপান্তর—ব্রহ্মচারিণী গীতা)

শিবাকান্ত শম্ভো শশাঙ্কার্দ্ধ মৌলে
মহেশান্ শূলিন্ জটাজুট ধারিন্।
ত্বমেকো জগদ্ব্যাপকো বিশ্বরূপঃ
প্রসীদ প্রসীদ প্রভো পূর্ণরূপঃ॥

১৬ই জুন ২০১৩

উত্তরাখণ্ডের তপোভূমিতে তীর্থযাত্রীদের ভীড় লেগে রয়েছে। যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ ধামের যাত্রা আরম্ভ হয়ে গেছে। ১৩ই মে ২০১৩, অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্যতিথিতে উত্তরাখণ্ডের দেবভূমির কপাট (দ্বার) উন্মোচিত হয়েছে পুণ্যপ্রার্থী যাত্রীদের জন্য। মহাভারতের কাল হতে এই যাত্রা চলে আসছে। পঞ্চপাণ্ডব সশরীর স্বর্গারোহণে চলেছিলেন এই মার্গে। মন্দাকিনীর তটে হিমশিখরের মধ্যে পাথর কেটে কেদারনাথের মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন পাণ্ডবেরা যা আজও প্রকৃতির প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যেও ভীষণ প্রাকৃতিক দুর্যোগেও অক্ষুণ্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

যুগ-যুগ ধরে চলে আসা এই যাত্রার পরম্পরাকে নির্বাহ করে আসছেন ভগবদ্ভক্ত যাত্রীগণ। গৌরীকুণ্ড হতে নিজের নিজের ক্ষমতা অনুসারে পদব্রজে, কাণ্ডি, ডাণ্ডি, ঘোড়া অথবা খচ্চরের মাধ্যমে যাত্রীরা কেদারনাথ মন্দিরের প্রাঙ্গণে পৌঁছান। আজও কেদারনাথের মন্দির প্রাঙ্গণ সহস্রাধিক ভক্তপ্রাণ নরনারীদের দ্বারা পূর্ণভাবে পরিবেষ্টিত ছিল। দিন প্রতিদিন উত্তরাখণ্ডের দেবভূমিতে সমাগত যাত্রীদের সংখ্যায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হচ্ছিল। এর একমাত্র কারণ ছিল বিভিন্ন ভৌতিক সুবিধার উপলব্ধি। মন্দিরে ঘন্টাধ্বনি হচ্ছে, লোক নিজেদের প্রান্তে অবস্থিত প্রিয়জনদের মোবাইলের মাধ্যমে কেদারনাথের আরতির ঘণ্টানাদ শোনাচ্ছে, অথবা কেউ মোবাইলে প্রকৃতির রমণীয় দৃশ্যকে অবরুদ্ধ করছে। আশেপাশের পূজা

* বেদসারঃ শিবস্তোত্রম্।
(তুমি ছাড়া আর কেউ বরণীয় নয়, মাননীয়ও নয় আর কেউ গণনার যোগ্যও নয়)

সামগ্রীর দোকান হতে পূজার শ্রীফল, আগরবাতী, প্রসাদ প্রভৃতি নিয়ে শীঘ্র অগ্রসর হচ্ছেন মন্দিরের দিকে যাত্রীরা, চায়ের দোকানে পা রাখার জায়গা নেই, ছোট হোটেলের মত দোকানে প্রাতরাশে গরম সিঙ্গারা ও জিলেপী উপভোগেরত জনতা এবং আশেপাশের অবস্থিত হোটেল, ধর্মশালাতে ঠাসাঠাসি ভীড়। মন্দির প্রাঙ্গণ "ওঁ নমঃ শিবায়" ধ্বনিতে গুঞ্জায়মান রয়েছে। গর্ভগৃহে আরতি হচ্ছে। জনতা অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে জ্যোতির্লিঙ্গ কেদারেশ্বরের ধ্যানে মগ্ন রয়েছে। প্রধান পুরোহিত ঘন্টা নিনাদের সঙ্গে আরতি করছেন- "আরতী হর কী" অকস্মাৎ তুমুল গর্জনের সঙ্গে মন্দাকিনীর উন্মত্ত প্রবাহ দুইদিক হতে মন্দির কে নিজের মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলে। গর্ভগৃহে পাঁচফুট জল ভরে যায়। প্রধান পুরোহিতের গলা পর্যন্ত জল এসে যায় তিনি জীবনের আশা ছেড়ে দেন কিন্তু হাতের গরুড় ঘণ্টা ছাড়েননি। পাঁচ মিনিটে প্রবাহ আগে প্রবাহিত হয়ে যায় গর্ভগৃহ খালি করে। মন্দিরের পিছনের গান্ধী সরোবরে বাদল ফাটাতে প্রলয়ধারার মত মন্দাকিনীর জলধারা প্রচন্ড তান্ডব নৃত্য করতে করতে পাহাড়কে ভেঙে চুরমার করে বড় বড় শিলাখণ্ড সঙ্গে নিয়ে জলের প্রলয় প্রবাহের সঙ্গে জন প্রবাহ নিয়ে আগে অগ্রসর হচ্ছিল। মাত্র দশমিনিটও কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কোথায় গেল সেই জন কলরব জন কোলাহল! চন্দন ভস্ম বিল্বপত্রে পুষ্পে আবৃত জ্যোতির্লিঙ্গ শবসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত হলেন। কোথায় গেল চেতনা! চতুর্দিকে শব শুধুই মৃতদেহ! প্রিয়জনদের অন্বেষণের হাহাকার। প্রাণের চেতনা যা কিছুক্ষণ আগেও দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল এক নিমেষের মধ্যে কোথায় বিলীন হয়ে গেল। যেন জাদুগরের রূপালী কাঠির ছোঁওয়ায় সব অবলুপ্ত হল। অক্ষুণ্ণ ছিল শুধু মন্দিরের গর্ভগৃহ। তাও ভক্তদের নির্জীবদেহে পরিপূর্ণ ছিল। তার মধ্যেই কোথাও কেথাও প্রাণের সঞ্চার দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। প্রকৃতির এই উন্মত্ত তান্ডব এখানেই সীমিত ছিল না রাস্তায় আগত অগণিত ছোটছোট বস্তি (গ্রাম) ক্ষেত খামার নিজের সঙ্গে নিয়ে মন্দাকিনীর ধারা উবড় খাবড় প্রস্তরাকীর্ণ পথে শিলাখণ্ডের মধ্য দিয়ে "হর কী পৌঢ়ী" পর্যন্ত এই ধ্বংসলীলার দৃশ্য নিয়ে পৌঁছাল। যা একটু বাকি ছিল তা মুসলাধার বৃষ্টি পূর্ণ করল। বৃক্ষসমূহ কাটার জন্য ঢিলা হয়ে যাওয়া পাহাড়ের ধ্বস নেমে আসতে লাগল তার সঙ্গে পাহাড়ে অবস্থিত ছোট ছোট বস্তিসমূহ ও কালকবলিত হতে লাগল। আসা যাওয়ার রাস্তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

মানব সভ্যতা মূক বধির হয়ে চোখের সামনে নিজেদের হাত হতে ছিটকে যাওয়া প্রিয়জনদের প্রচণ্ড জল প্রবাহের সঙ্গে প্রবাহিত হতে দেখল। পিতার হাত হতে হৃদয়ের ধন প্রিয় পুত্র জলের তান্ডবে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। ধরণীর পুত্রদের এইভাবে অসহায় দুর্দশা দেখে যেন আকাশচারী সিদ্ধগন্ধর্বগণ স্তুতি করছেন এই বাণীর দ্বারা–

"শম্ভো মহেশ করুণাময় শূলপাণে
গৌরীপতে পশুপাশনাশিন্।

কাশীপতে করুণয়া জগদেতদেক
স্ত্বং হংসি পাসি বিদধাসি মহেশ্বরোহসি ॥"

আজ আশুতোষ ভোলানাথ নিজের রুদ্ররূপে আছেন। মানুষের বিকরাল তৃষ্ণার প্রবৃত্তিতে আজ ক্ষুব্ধ হয়েছেন বিশ্বনাথ। দেবভূমিকে ভোগভূমিতে পরিণত করার শিথিল প্রয়াসকে আজ তাদের চোখের সামনেই ভেঙে চুরমার করে দিলেন প্রভু শূলপাণি। আজ ভোলাভান্ডারী বিনাশলীলার মাধ্যমে দুঃখ শোকরূপে স্বয়ং প্রকাশিত হয়েছেন।

চলুন আপনাদের নিয়ে চলি আজ থেকে ৫৮ বছর আগে ১৯৫৪ সালে ঘটিত প্রয়াগের পূর্ণ কুম্ভমেলাতে যেখানে বিশেষ স্নানের দিন পুল ভেঙে যাওয়ায় অগণিত স্নানার্থীদের মৃত্যু হয়। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী তখন ভক্তপরিকর সঙ্গে কুম্ভ মেলাতেই বিরাজ করছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী" গ্রন্থসমূহের লেখিকা এবং শ্রীশ্রীমায়ের অনন্যা সেবিকা গুরুপ্রিয়াদেবীও ছিলেন। তিনি তাঁর একাদশ ভাগে এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন। স্বামী পরমানন্দ স্বামীজীও মার সঙ্গে ছিলেন। ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৫৪ বিশেষ স্নানের যোগ ছিল। অপার জনসমূহ এই অমৃতযোগে সঙ্গমে স্নান করার জন্য চলে আসছিল। দৈবযোগে ভীড় অধিক হওয়ার জন্য পুল ভেঙে গেল। হাহাকার হতে লাগল। গুরুপ্রিয়াদি লিখছেন, "আমরা মাকে নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে এলাম। পৌঁছেই মা জিজ্ঞাসা করলেন– "কোনও খবর এসেছে নাকি?" মার কথার অর্থ তখনও আমরা বুঝতে পারিনি। বিরাট দুর্ঘটনার সংবাদ তখনও আমাদের কাছে এসে পৌঁছায়নি। একটু পরেই যখন মর্মান্তক খবর এল তা শুনেই মা বলে উঠলেন—"দেখা যাচ্ছিল পরিষ্কার স্তূপাকার মৃত দেহ।" মার ভাবান্তরের কারণ এতক্ষণে বুঝতে পারা গেল।"

কেউ মাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে এতলোক সকলেরই কি অপমৃত্যু হল? মা উত্তরে বললেন, "অপমৃত্যু যেমন, আবার অন্য কথাও তো– ত্রিবেণী ক্ষেত্র, কুম্ভযোগ, গঙ্গাস্নান লক্ষ্য। এসবও তো আছে।"

৬ই ফেব্রুয়ারী মা কাশী পৌঁছালেন। হরিবাবা সঙ্গে ছিলেন। গুরুপ্রিয়াদিদির অনুসারে— "কেউ মাকে প্রশ্ন করলেন—"তুমি যে বললে চাপা পড়ল, নিঃশ্বাস বন্ধ, তুমি কি শুধু যারা চাপা পড়ল তাদেরই দেখলে?

মা বললেন, "যারা বেঁচেগিয়েছিল তাদেরও দেখা গেল। আর যারা চোখ বুঝল তাদেরও দেখলাম। যেখানে ঘটনাটি ঘটল এমন হল যেন এইশরীরই চাপা পড়েছে– এবং এই শরীরেরই যেন শ্বাসবন্ধ হয়ে আসছে।"

প্রশ্ন হল– এমনটি কেন? তুমি কি তাদের কষ্ট নিয়ে নিলে?" মা বললেন—"জগতের মত শ্বাস বন্ধনের দিক এটা না। তোমাদের হাসিতে যেমন হাসা হয়, তোমাদের কথায় যেমন কথা

বলা হয় যেমন তেমন থেকেও। শ্বাসবন্ধ রূপেই বা কে? কষ্ট রূপেই বা কে? আর তাদের ভোগ নিয়ে নেওয়া এটা অন্য কথা। সব ক্রিয়াটা সবটাতে সম্ভব নাত। কিন্তু সবটাই যে তৎ। এখানে হাসি যা, খেলাও তাই, আর শ্বাস বন্ধটাও সেই তৎ। সেই দিকের ক্রিয়া। এখানেত ভোগের ভাগ না-কষ্টের ভাগ না-সম। আবার এটাও না হয়ে পারত। খেলা আর কি! ভোগ নেওয়া মানে ভাগ লওয়া। সেখানে নেওয়া দেওয়ার কথা।"

আবার প্রশ্ন হল–"এই যে এতলোকের অপমৃত্যু হল এদের কি গতি হল?" মা উত্তর দিলেন–"শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে ক্রম গতিতে এই কথা বিশেষ যেখানে সেখানকার কথা আলাদা। ধারণা হয় বিচারে কারণ যা তার একটা আভাস তো দিবেই। আর এখানে দেখো কুম্ভযোগ, ত্রিবেণী ক্ষেত্র, সাধুদের বায়ুমণ্ডল, মহাত্মাদের সব একমুখী গতি। এই সময়ে মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যু কিনা, তাই একটা বিশেষ গতির দিকত বটেই।"

(একাদশভাগবাংলা পৃ. ১৮৭-১৯০)

বর্তমান প্রাকৃতিক সংকটে শ্রীশ্রীমায়ের বাণীতে মন দিলে বুঝতে পারা যায় যে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে অত্যন্ত পীড়ার যে চরম অবস্থা দেখা গিয়েছে, তা সর্বচরাচরের স্বামী পরমাত্মারই খেলা। তাই আমরা মাতৃবাণীতে দেখতে পাই পীড়িতদের চাপা পড়া নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়া সবই মায়ের শ্রীশরীরে অনুভূত হচ্ছিল কেন হবে না এক আত্মাইতো চরাচর বিশ্বে ব্যাপ্ত রয়েছে। তারই অনন্তরূপের এও এক রূপ। সকল পরিস্থিতিতেই সেই চিরন্তন সঙ্গে রয়েছেন। এরই সঙ্গে যখন অপমৃত্যুর কথা ওঠে তখন মায়ের উপর্যুক্ত বাণীতে স্পষ্ট হয়েছে যে স্থান বিশেষ, লক্ষ্য বিশেষে মৃত আত্মাদের এক বিশেষগতি তো হয়েই থাকে। এখানেও উত্তরাখণ্ডের কেদারধামের যাত্রা, দেবভূমি তপোভূমি পবিত্র বায়ুমণ্ডলে যারা প্রাণত্যাগ করেছে তাদের উর্ধ্বগতি তো অবশ্যম্ভাবী। যদি আমরা এই প্রাকৃতিক বিপদের বিষয়ে চিন্তা করি তবে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে স্বার্থী মানুষ নিজের তৃষ্ণাপূর্তির জন্য প্রকৃতিকে নিজের বশীভূত করতে চেয়েছে, মাতৃ স্বরূপিণী প্রকৃতি কিছু সীমা পর্যন্ত তো তাদের সহযোগিতা করেছে, কিন্তু যখন মানবীয় প্রকৃতি নিজের সীমার উল্লঙ্ঘন করেছে, তখন দৈবীপ্রকৃতি নিজের রৌদ্ররূপ প্রকট করে মানব সভ্যতাকে অসহায় করে দিয়েছে। এখন মানুষের কাছে উর্ধ্ববাহু হয়ে তাঁর বন্দনা ছাড়া আর কোন উপায় ছিলনা।

"নমস্তে নমস্তে বিভো বিশ্বমূর্তে, নমস্তে নমস্তে চিদানন্দ মূর্তে।
নমস্তে নমস্তে তপোযোগগম্য, নমস্তে নমস্তে শ্রুতিজ্ঞানগম্যঃ ॥"

উত্তরকাশীতে কন্যাপীঠ

ব্রহ্মচারিণী গীতা

কাশীর প্রচণ্ড গরমে সন্ত্রস্ত হয়ে আগেই ঠিক করেছিলাম এবার গরমের ছুটিতে উত্তর কাশীতে যাব যেখানে মা গঙ্গা ও হিমালয়ের উত্তুঙ্গ পর্বত শ্রেণীর অপূর্ব শোভা এক বিশেষ আকর্ষণের বস্তু, প্রথমেই ঠিক হয়েছিল আমরা শুধু চার পাঁচ জন বড়রাই যাব কিন্তু পরে ঠিক হল যে কন্যাপীঠের সব ছোট মেয়েরাও উত্তরকাশী যাবে। সেই অনুসারে সর্ব সমেত ২৫ জনের দুন এক্সপ্রেসে ৫ই জুন টিকিট কাটা হল। আমরা কনখল রওনা হলাম। ৬ই জুন আমরা কনখল পৌঁছালাম। স্টেশনে গাড়ী নিয়ে অজয়, নরোত্তম ও আরও কয়েক জন উপস্থিত ছিল। আমরা আগেই আমাদের আসার খবর অরুণাজীও সুমুদাকে সংঘের বর্তমান জেনারেল সেক্রেটারী সোমেশচন্দ্র ব্যানার্জী কে দিয়েছিলাম। সেই অনুসারে করেছিলেন সব ব্যবস্থা আমরা পৌঁছেই স্নান ইত্যাদি সেরে সমস্ত ছোট মেয়েদের নিয়ে আনন্দজ্যোতিপীঠে প্রণাম করতে গেলাম সেই সময় কনখলে বিদ্যাপীঠের ছেলেরা ছিলনা তাই কন্যাপীঠের ছোট মেয়েদের দেখে সকলে খুব খুশী হল। মেয়েদের সাদরে সপ্রেম খুবই স্বাগত সৎকার করা হল। মেয়েরা খুব খুশী।

সকালে উঠে শিব মন্দিরে গিয়ে বেদপাঠ স্তবপাঠ ইত্যাদি করে মা গঙ্গা এবং দক্ষ মন্দিরের সমস্ত দেবী দেবতাকে প্রণাম করে মেয়েরা আনন্দজ্যোতিপীঠে এসে বিষ্ণু সহস্রনাম গীতা, চন্ডী পাঠ কীর্তন ইত্যাদি করে পুজাও আরতির প'রে মায়ের মন্দির প্রণাম করে মেয়েরা লাইন করে জলখাবার খেতে শিব মন্দিরে যেত। তারপর দুপুরের ভোগপর্যন্ত মেয়েরা ওখানেই খেলত। ভোগের পরে মেয়েরা প্রসাদ গ্রহণ করে ঘরে ফিরে আসত। বিকালে প্রতিদিন জলখাবার থাকত। আবার সন্ধ্যাবেলা মায়ের মন্দিরে স্তব রামায়ণপাঠ আরতি ও কীর্তনের পর মেয়েরা রাত্রির আহার সমাপ্ত করে প্রার্থনা করে ঘুমিয়ে পড়ত। সকালে উষা কীর্তন নিজেদের ঘরেই করত। ব্রহ্মচারিণী নিরঞ্জনীদি কন্যাপীঠের কিছু বড় মেয়েদের সহযোগিতায় মেয়েদের দেখাশুনা করতেন। খাবার ব্যবস্থা অরুণাজী করতেন। এই ভাবে ১০ জুন পর্য্যন্ত চলল।

এদিকে প্রচণ্ড বৃষ্টিতে উত্তরাখণ্ডের অবস্থা দেখে সকলে চিন্তিত হলেন। সকলেই বলছিলেন "তোমরা কনখলেই থেকে যাও আমরা তোমাদের ঋষিকেশ, দেরাদুন, মুসৌরী, গঙ্গোত্রী ঘুরিয়ে দেব।" এদিকে উত্তরকাশীতে যোগেনভাই বাসমতী চাল, আটা কিনে রেখেছিল। আমরা মুঁগডাল, ছোলার ডাল, অরহর ডাল, মুড়ি, চিড়া, যবের ছাতু ছোলার ছাতু কিনে নিয়েছিলাম। সুমুদা দুই টিন সরষের তেল এবং ঘি দিয়েছিলেন। তাই সকলের নিষেধ সত্ত্বেও

আমরা রওনা হলাম। উত্তরকাশীর মা কালী যেন মনের অন্তরে প্রেরণা দিচ্ছিলেন "তোমরা উত্তরকাশী এসে যাও" আমি সকলকে বললাম "উত্তর কাশী যাবার জন্য এসেছি কনখল থাকার জন্যে নয় তাই আমরা উত্তরকাশীই যাব।" অবশেষে উত্তরকাশী যাওয়া ঠিক হল।

আমরা সকলে বাস ভাড়া করে ১১ই জুন উত্তর কাশী রওনা হলাম। সঙ্গে ছিল উদয়ন চক্রবর্তী, নরোত্তম, কৃষ্ণকান্ত দুবে এবং বিমল। বিকাল ৫টায় আমরা উত্তরকাশী পৌঁছালাম। যোগেন ভাই সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। অতিথি ভবনের চারটা ঘর আমাদের জন্যে রাখা ছিল। সর্ব প্রথম আমরা মা কালী, বাবা ভোলানাথ, লক্ষ্মী নারায়ণ, দেবী ভবানী, গণেশজী ও শ্রীশ্রী মায়ের মূর্তি প্রণাম করলাম। মা কালীকে বেশ প্রসন্ন দেখলাম। সঙ্গে লুচি আলুর দম ছিল তাই সকলে মিলে জলখাবার খেলাম। তার পর ঝোল ভাত করে রাত্রির আহার সম্পন্ন হল। পরদিন থেকে মেয়েরা প্রতিদিন উষা কীর্ত্তন, স্তব পাঠ, গীতাচন্ডী পাঠ করে জল খাবার খেয়ে পড়াশুনা করত। লুডো, ফুটবল, ব্যাডমিন্টন খেলত। সাইকেলও চালাত।

ছোট মেয়েদের জন্য পুতুল, খেলনার রান্নাবাটি এবং আরোও অনেক খেলনা যোগেনভাই এনে দিয়েছিল। মেয়েরা সারাদিন খেলত। দুপুরবেলা অন্নভোগ গ্রহণের পর মেয়েরা কখনও মায়ের সী.ডী. ও অন্য আধ্যাত্মিক সী.ডী. দেখত। বিকেলে খেলার পর মার বই পাঠ, স্তব রামায়ণ ও সান্ধ্যকীর্তনের পর ভোজন ও রাত্রিশয়ন প্রার্থনা করে মেয়েরা শুয়ে পড়ত। মেয়েদের কার্যক্রম এইরূপ ছিল।

উত্তরকাশী আশ্রমের পরিবেশ খুবই শুদ্ধ পবিত্র ও সাত্বিক ছিল। প্রাত:কাল হতে মাইকে ছবিদির উষাকীর্তন এবং ধর্মীয় সঙ্গীত সারাদিন চলতে থাকত। খুবই ভাল লাগত। এখানে যা খাওয়া দাওয়া হত সব মা কালী ও মাকে ভোগ দিয়েই খাওয়া হত। মেয়েরা কখনও আশ্রমের বাগান হতে পুষ্পচয়ন করে মালা গেঁথে মা কালী ও মাকে পরাত। তাতে অপূর্ব শোভা হত। আমি বলতাম, "মা কালীও কন্যাপীঠের একটি কন্যা। তাই তাঁকে ও অতটাই আদর যত্ন করতে হবে।" প্রতিদিন রাত্রিবেলা কীর্তনের সময় বাংলা শ্যামা সঙ্গীত গাওয়া হত।

ভোগরান্না মেয়েরাই করত। কখনও আনন্দময়ী ব্রহ্মখিচুড়ি, চাটনী পায়েস দিয়ে ভোগ দেওয়া হত। কখনও খিচুড়ি মা কালী, বাবা ভোলানাথ ও মাকে ভোগ দেওয়া হত। যোগেন ভাই তো খুব খুশী। আশেপাশের সমস্ত ভক্তদের অন্নপ্রসাদ বিতরণ করত। লীলা ময়দানে ভাগবতসপ্তাহ হচ্ছিল। বক্তা কাশীর লোক। কাশী ও বৃন্দাবনে প্রবচন করে থাকেন। তিনি মাকে জানেন। তিনি রোজ সকালে এসে মাকালী ও মাকে প্রণাম করে যান। তাঁর আমন্ত্রণে একদিন মেয়েরা তাঁর ভাগবতে গিয়ে মঞ্চে বসে বেদপাঠ করল। সেখান থেকে রাজস্থানী মন্দিরে গিয়ে মা ভবানী ও একাদশ রুদ্রকে দর্শন ও প্রণাম করে এল।

১৫ই জুন রাত্রি হতেই খুব মেঘের গর্জনের সঙ্গে মুসলাধার বৃষ্টি আরম্ভ হল। ১৬ই জুন

সারাদিন অখণ্ড বৃষ্টি হল। এরই সঙ্গে ৩/৪ ফুট উঁচু গঙ্গার উত্তাল তরঙ্গ দেখে মনে ভীতির সঞ্চার হল। জলে এত Current যে সব কিছু মুহূর্তের মধ্যে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। শোনা গেল যে সম্পূর্ণ উত্তরাখণ্ডে হিমালয়ী সুনামীর প্রকোপ দেখা দিয়েছে। কেদারনাথ উজাড় হয়ে গেছে। বদ্রীনাথ, গঙ্গোত্রীর রাস্তাও বন্ধ হয়ে গেছে। আমাদের গঙ্গোত্রী যাত্রা স্থগিত হল। পাহাড়ের ধ্বস নেমে তাতে লাখ-লাখ লোক চাপা পড়ে মরে গেছে। উদ্দাম নৃত্যে জল গ্রামকে গ্রাম সব ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। উত্তরকাশীর অবস্থাও ভয়াবহ ছিল। সকলে বলছিল যে উত্তরকাশীতে এমন জল দেখিনি। অনেক চারতলা বাড়ী, হোটেল ইত্যাদি গঙ্গা ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু মায়ের কালী মন্দির সুরক্ষিত ছিল। বিজলীর পোল ভেঙে যাওয়াতে জলও বিজলীবাতি তিনদিন উত্তরকাশীতে গায়েব ছিল। মাথার উপর সারাক্ষণ হেলিকপ্টার উড়ছে। সবকিছুই যেন নিমিষের মধ্যে উলট্‌পালট্‌ হয়ে গেল কিন্তু মায়ের কৃপায় কয়েক দিনের মধ্যেই আবার সব ঠিক হয়ে গেল।

১৮ই জুন গঙ্গাদশহরার দিন পাশের কেদার ঘাটে গিয়ে গঙ্গাপূজা করা হল। স্রোতস্বিনী গঙ্গার ক্ষিপ্তজলরাশিও উদ্দাম স্রোত দেখে কারুর আর গঙ্গার স্নান করার সাহস হল না। সকলে মাথায় জল স্পর্শ করল। কিন্তু পূজা খুব সুন্দর হল। খোল, করতাল, কাঁসর, ঘণ্টা বাজিয়ে খুব জমজমাট কীর্তন হল। "দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে" "পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে" এই সঙ্গীতের সুরলহরী মা গঙ্গার উদ্দাম তরঙ্গে লহরে লহরে মিশে গিয়ে তরঙ্গায়িত হতে লাগল। পূজার পর সকলকে প্রসাদ দেওয়া হল। গঙ্গা দশহরার পূজার পরই মা গঙ্গা একটু শান্ত হলেন। আমরা একাদশীর দিন ১৯শে জুন এখানে বিশ্বনাথের মন্দিরে পূজাও প্রণাম করে এলাম। একদিন আমরা কৈলাস মঠে গেলাম। সেখানকার সাধুজী ও মেয়েদের সাদরে স্বাগত জানালেন। দেখলাম ১৯৭৩ সালে যেখানে মার জন্মোৎসব হয়েছিল, সে সব জায়গা ভেসে গেছে মায়ের নামে লিখিত ঘাট ও নেই।

২০শে জুন যোগেন ভাইয়ের প্রয়াত ভ্রাতার আত্মার শান্তির জন্য বিশেষ কীর্তন অনুষ্ঠিত হল। এদিকে দিল্লী, মুম্বাই, কোলকাতা কনখল সব জায়গা থেকে ফোনের পর ফোন আসতে লাগল যে তোমরা উত্তরকাশী হতে নেমে এসো। কিন্তু কি ভাবে নামবো। রাস্তা পরিষ্কার হবে তবেই না নামা সম্ভব হবে। ঠিক করা হল যে হেলিকপ্টারে নামা হোক কিন্তু তা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাধ্য। পরে জানা গেল যে সারা উত্তরকাশীতে মাত্র দুটি বাস রয়েছে। কিন্তু ঋষিকেশ পরমার্থ নিকেতনের আটটি বাস এসেছে। সেখানকার স্বামীজী যোগেন ভাইয়ের মুখে মায়ের আশ্রমের মেয়েদের কথা শুনে বললেন, "আপনাদের বাস সকলের আগে যাবে।" ২২শে জুন নিরঞ্জনীদি আশ্রমের যজ্ঞশালাতে গায়ত্রী মন্ত্রে যজ্ঞ করালেন। ২৩শে জুন ভোরে আমরা মা কালী, মা ও বাবা ভোলানাথ, লক্ষ্মীনারায়ণ, গণেশ, ভবানী সকলকে প্রণাম করে বাসে কনখল

রওনা হলাম। বাসে উঠে "শ্রী দুর্গার নাম ভুলোনা। যদিও কখনও বিপদঘটে শ্রীদুর্গাস্মরণ করগো সংকটে" এই গানও "দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে" ইত্যাদি গঙ্গাস্তোত্র গাইতে লাগলাম। জায়গায় জাযগায–আপদকালীন সহায়তায় সংযুক্ত লোকেরা বাস থামিয়ে বিস্কুট, জল. সরবত, রুটি. তরকারী নিষেধ করা সত্ত্বেও দিয়ে গেছে। সবচেয়ে দুঃখজনক হল লোকেরা নিজেদের হারিয়ে যাওয়া পরিজনদের ফটো দেখিয়ে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করছিল, "এদের কি তোমার দেখেছ?" না বলায় তাদের মলিন মুখ দেখে আমরাও দুঃখিত হচ্ছিলাম। অবশেষে জায়গায় জায়গায় রাস্তা খারাপ থাকা সত্ত্বেও আমাদের বাস টিহরী পেরিয়ে নরেন্দ্রনগরে এল। আবার আরেক বিভ্রাট হল অন্ধকার ঘনিয়ে বৃষ্টি এল। রাস্তাই দেখা যাচ্ছিল না। অতি সন্তর্পণে বাস এগোতে লাগল। আমরা মায়ের কৃপায় হৃষিকেশ পৌছে গেলাম। বাসওয়ালারা একটি ও পয়সা নিল না। এদিকে অরুণাজী রামপঞ্জবানীর স্কুলবাস ও আশ্রমের ভ্যান নিয়ে নরেন্দ্রনগর পৌঁছে গেল। কিন্তু আমরা হৃষিকেশে এসেই বাসের মাল নামিয়ে বাচ্চাদের স্কুলবাসে মাল সহচড়ালাম। আমরা ভ্যানে চড়লাম। বলাই বাহুল্য হৃষিকেশ থেকে কনখল আসারও একটি টাকাও লাগল না। সবই মায়ের লীলা! মায়ের কৃপা! আমরা বিকাল ৬টায় কনখল পৌছলাম।

এদিকে শোনা গেল ২৫/২৬শে জুন উত্তরকাশীতে ভয়ানক বষ্টি হয়েছে। গঙ্গার জল আরোও বেড়ে গেছে। রাস্তা ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু এর আগেই আমরা মায়ের কৃপায় নির্বিঘ্ন রূপে কনখল পৌঁছে গেছি। একদিন আমরা রায়পুর, দেরাদুন ও কল্যাণবন সব দর্শন করে এলাম। চন্ডীদেবী ও মনসাদেবী মেয়েরা বিশুদ্ধাদির সঙ্গে করল। ২৯শে জুন কাশীর টিকিট ছিল। ৩০শে জুন কাশী পৌঁছলাম।

উত্তরাখণ্ডে হিমালয়ী সুনামীর সময় উত্তরকাশীতে কন্যাপীঠের নির্বিঘ্নরূপে অবস্থান পরমকরুণাময়ী মায়ের অপার করুণার ও স্নেহবাৎসল্যের একটি জাজ্বল্যমান নিদর্শন রূপে পরিগণিত হবে।

জয় মা।

আশ্রম বার্তা

আনন্দ স্বরূপেষু,

গত সংখ্যার পর এই সমকালীন অনেক বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে যেমন বারাণসীতে বাসন্তী পূজা, কনখল ও মায়ের প্রতিটি আশ্রমে মার জন্মোৎসব আর তিথিপূজা, অক্ষয় তৃতীয়া প্রভৃতি। আমরা আপনাদের বিবরণ যথাযথভাবে প্রস্তুত করতে প্রয়াসরত হচ্ছি। বিশেষতঃ বিন্ধ্যাচল আশ্রমের "জন-জনার্দন সেবা" উল্লেখযোগ্য।

ইং ২০১২–১৩ সালে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম, বিন্ধ্যাচলে অনুষ্ঠিত উৎসবও বিশেষ ধার্মিক কার্যাবলীর বিবরণ—

কার্যাবলীকে দুভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে যথা–এক নিয়মিত দৈনন্দিন কার্যাবলী এবং দুই নির্দিষ্ট বিশেষ সময়ে বিশেষ কার্যাবলী। নিম্নে বিস্তারিত উল্লেখ করা হচ্ছে।

এক নিয়মিত দৈনন্দিন কার্যাবলীঃ—

(ক) প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় নিয়মিতভাবে শ্রীশ্রী মায়ের সংক্ষিপ্ত পূজা-আরতি। এছাড়া উক্ত আশ্রমে স্বামী অখণ্ডানন্দজী কর্তৃক তৈরী যে গুহাগহ্বর কক্ষটি (ধ্যান মন্দির) রয়েছে এর অভ্যন্তরে যে নর্মদেশ্বর শিব রয়েছেন তাতে ও নিত্য সকাল-সন্ধ্যায় পূজা–আরত্রিক অনুষ্ঠিত হয় নিয়মিত ভাবে।

(খ) বিন্ধ্যাচলে মায়ের আশ্রমে একটি হোমিওদাতব্য চিকিৎসালয় রয়েছে। এর জনপ্রিয়তা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। উক্ত চিকিৎসালয়ে কয়েকজন হোমিও অভিজ্ঞ ডাক্তার এবং আশ্রমবাসী জনৈক সন্ন্যাসী বিশেষভাবে সেবা কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। সপ্তাহে দুদিন–বৃহস্পতিও রবিবার মির্জাপুর শহর হতে জনৈক অভিজ্ঞ হোমিও ডাক্তার-BHMS এসে থাকেন। আর হোমিওপ্যাথিক বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ উক্ত আশ্রমবাসী সন্ন্যাসী রোজই রোগীদের চিকিৎসা করে থাকেন। "রোগরূপী জনজনার্দনের সেবা"–শ্রীশ্রী মায়ের এই মহান শাশ্বত বাণীটিকে তিনি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে উক্ত জনার্দনের সেবা পরম নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে যাছেন। তাঁর পরম আন্তরিকতার ফলশ্রুতিতে প্রতিরবিও বহস্পতিবারে উক্ত সেবা প্রাপ্তির জন্য আশ্রম চত্বরে শতাধিক রোগীর ভীড় হয়-যেন এক ছোট্ট মেলা বসে। এই পাহাড়ের উপরে প্রখর রৌদ্র তাপকেও অগ্রাহ্য করে সকাল থেকেই যে কি ভীড় হয়–ছোট্ট শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ বৃদ্ধা রোগীদের-তা স্বচক্ষে দর্শন করে অনেক বহিরাগত দর্শনার্থী স্তম্ভিত হয়ে যায়। অনেক ক্রণিক

জটিল অপারেশনের কেস ও হোমিও চিকিৎসায় সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেছে। আর এর ফলশ্রুতিতে অনেক দূর দূরান্তের জেলা হতেও রোগীদের আগমন ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। উপরোক্ত ডাক্তার ও স্বামীজী ব্যতীত-মির্জাপুর শহর হতে হোমিও প্যাথিক জনৈকা বিশেষ অভিজ্ঞ মহিলা ডাক্তার সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন উক্ত চিকিৎসালয়ে সেবা প্রদান করে যাচ্ছেন। আর স্থানীয় পাঁচজন সেবক উক্ত দাতব্য চিকিৎসালয়ে নিয়মিতরূপে ঔষধ বিতরণের কাজে ত্রুটিহীন সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমান বর্ষে সর্বসমেত মোট ৭,৪৬৪ জন রোগীর নিঃশুল্ক চিকিৎসা উক্ত চিকিৎসালয়ে সুসম্পন্ন হয়েছে।

(গ) সাপ্তাহিক সৎসঙ্গঃ—

আশ্রমের প্রতি রবিবার সৎসঙ্গের দিন প্রতি রবিবারে আশ্রমে সাপ্তাহিক সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মির্জাপুর শহর হতে ভক্তগণ এসে অংশ গ্রহণ করেন।

দুই নির্ধারিত সময়ে বিশেষ অনুষ্ঠানাদিঃ—

ইং ৮ই এবং ৯ই মে ২০১২ শ্রীশ্রী মায়ের জন্মতিথি উৎসব মায়ের আশ্রমে মহান উৎসাহ উদ্দীপনা এবং সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। ষোড়শোপচারে শ্রীশ্রী মায়ের পূজা, পাদুকা অভিষেক, হোম ইত্যাদি অনুষ্ঠান শাস্ত্রবিধি অনুসারে পালিত হয়। পূজার পরে ভক্তগণের মধ্যে অন্ন প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

(খ) গুরুপূর্ণিমা উৎসব—

৩রা জুলাই, ২০১২ গুরুপূর্ণিমা উৎসব বেশ জাক জমকের সঙ্গে সুসম্পন্ন হয়। যাতে নিম্নলিখিত কর্মসূচী সুন্দররূপে পালিত হয়।

(i) শ্রীশ্রী মায়ের ষোড়শোপচারে পূজা, (ii) শ্রীশ্রী মায়ের পাদুকা অভিষেক, (iii) কুমারী পূজা, (iv) ৯ জন কুমারী ও একজন বটুককে ভোজন করানো, (v) সূর্যোদয়ের পূর্ব হতে অখণ্ড মাতৃনাম জপ অনুষ্ঠান, (vi) নাম কীর্তন, (vii) চণ্ডী, গীতা ও গুরুগীতা পাঠ, (viii) কয়েকশত ভক্তগণকে অন্ন প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

(গ) শারদীয় নবরাত্রিতে (১৬ই অক্টোবর হতে ২৩শে অক্টোবর ২০১২ পর্যন্ত) শ্রীশ্রী চণ্ডিকা দেবীর শাস্ত্র বিধিবৎ পূজাও চণ্ডী পাঠের অনুষ্ঠান।

(ঘ) গীতা জয়ন্তী (২৩শে-ডিসেম্বর, ২০১২) অনুষ্ঠান পরম উৎসাহের সঙ্গে পালিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রায় ১০জন ভক্ত সমবেত স্বরে সম্পূর্ণ গীতাপাঠে অংশ গ্রহণ করেন।

(ঙ) ১০ই মার্চ ২০১৩ মহাশিবরাত্রি উৎসবে বেশ কিছু ব্রতী অংশগ্রহণ করেন। সবাই রাত্রির চার প্রহরেরই শিবপূজায় অংশ গ্রহণ করেন। পূজার ফাঁকে ফাঁকে শিব মহিম্নস্তোত্রও

অন্যান্য শিব স্তোত্রাদি পাঠ চলে। আর পরিশেষে শিবরাত্রির ব্রতকথা পাঠ করে পূজা সম্পন্ন হয়।

(চ) প্রতিবছরের মত এবারও বসন্তকালীন নবরাত্রিতে বিধিবৎ চন্ডী মাতার পূজা হয় নয়দিবসই। নবম দিনের পূজার সমাপ্তির পর হোম অনুষ্ঠিত হয়।

বর্তমান সংবাদ

গত ১৪ই এপ্রিল স্বামী মুক্তানন্দ গিরিজীর সন্ন্যাস উৎসব প্রেমপূর্ণ ভাবপূর্ণ পূজা, ভজন কীর্তনের সঙ্গে কনখল, কোলকাতা, রাঁচী, দিল্লী, বারাণসী প্রভৃতি মায়ের আশ্রমে সুন্দর রূপে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাসন্তী পূজা বারাণসী—

বারাণসীর কুশল কলাকার শ্রী বংশীপাল মা বাসন্তী দুর্গাপ্রতিমা পরিবার ও বাহনের সঙ্গে খুবই প্রেম ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাবে অতি পবিত্র গঙ্গা মৃত্তিকাতে তৈরী করেন প্রতিবছরের মত এবারেও। ১৫ তাঃ এ সন্ধ্যায় বাদ্যের ঝংকারে মুখরিত আশ্রমে দেবীর আগমন হল ও চণ্ডী মণ্ডপে প্রবেশ করানো হল। মূর্তি খুবই সুন্দর হয়েছিল। জয়াদির তত্ত্বাবধানে অভিজ্ঞ অনুভবী অভিজিত, পূজরীর আসনে বসে শ্রদ্ধাভক্তিতে পরিপূর্ণ হৃদয়ের আবেগে পরিপ্লুত হয়ে সপরিকর দেবীকে প্রেমপূর্ণ ভাবে আবাহন করলেন। সকলের হৃদয়ে ঝলকে পুলকে উল্লাস সঞ্চারিত হচ্ছিল। কোলকাতা হতে বহু ভক্তের সমাগম হয়েছিল। ঢাকিদের ঢাকের বাজনাতে সকলে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। ঢাকের বাজনার সঙ্গে দেবী যেন সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করলেন। মা তো প্রেমময়ী ভাবময়ী, তাই ভক্তদের হৃদয়ের ভাব মায়ের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হচ্ছিল। অথবা মায়ের প্রেম, করুণা ভক্তহৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হয়ে প্রকাশ পাচ্ছিল। দেবীকে অপূর্ব সুন্দর লাগছিল, দেবীর থেকে চোখ ফেরানো যাচ্ছিল না। ষষ্ঠি, সপ্তমী, অষ্টমী, সন্ধিপূজা নবমী, রামনবমীর পূজা বিশেষ রূপে সম্পন্ন হয়েছে। মায়ের ষোড়শোপচার পূজার সময়ে যখন ধ্যানের মন্ত্র উচ্চারিত হত তখন মনে হত যেন মা স্বয়ং এসে বিরাজ করছেন। তখন ভক্তরা পুলকিত ও রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতেন। ভজন সন্ধ্যায় প্রথম দিন সপ্তমীতে কন্যাপীঠের সংগীত অধ্যাপিকা শ্রীমতী রত্নারায় নিজের স্কুলের মেয়েদের দিয়ে সরস্বতী বন্দনার সঙ্গে সুন্দর নৃত্যের প্রস্তুতি করালেন। সকলের খুব ভাল লাগল। মহিষাসুরমর্দিনীর স্তুতির সঙ্গে নৃত্য যথার্থই প্রশংসনীয় হয়েছিল। অষ্টমীর দিন কন্যাপীঠের মেয়েরা সমবেত ভাবে ও একাকিনী ভজন কীর্তন করে মায়ের চরণে সংগীতাঞ্জলি অর্পণ করে। বঙ্গীয় সমাজের গায়িকারাও এসে মায়ের সামনে বসে গান শোনালেন। নবমীর দিন মোহনানন্দ ব্রহ্মচারীজীর শিষ্য ভক্তরা এসে কীর্তন করে জমিয়ে দিলেন। সকলেরই প্রাণ মন নেচে উঠল। পূজার মধ্যে প্রতিদিন আনন্দের সঙ্গে

সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়েছে। দশমীর দিন বিধিবিধান সহ দেবীর অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বিসর্জন দেওয়া হল। কিন্তু ভক্তদের হৃদয়েত মা চিরতরে বিরাজিত রয়েছেন। শেষে বিজয়ার প্রীতি সম্মিলনীর সঙ্গে মহা সমারোহে বাসন্তীপূজার কার্যক্রম সম্পন্ন হল। এই উৎসবের মধ্যেই অষ্টমীর দিন আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রীদেবী মা অন্নপূর্ণার পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৩রা মে হতে ২৯শে মে পর্যন্ত শ্রীশ্রী মায়ের ১১৮ তম জয়ন্তী মহোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মায়ের সমস্ত আশ্রমে শতচন্ডী পাঠ, কুমারীও বটুকের পূজা ও ভোজন, সাধুভান্ডারা, নাম যজ্ঞ, শ্রীশ্রীমায়ের ষোড়শোপচার পূজা সহ সানন্দে প্রেম, শ্রদ্ধাভক্তির সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে। বিশেষ উল্লেখনীয় হল যে মায়ের সমাধিস্থলে মুখ্য কার্যালয়ে আনন্দজ্যোতিপীঠে বিশেষ বৈশিষ্ট্যসহ পরিপাটি সহ কার্যক্রম আয়োজিত হয়েছিল। মায়ের সুন্দর আনন্দজ্যোতিপীঠকে কলাপূর্ণভাবে সুসজ্জিত করা হয়েছিল কনখলে বিশেষ সাধু মহাত্মারা আমন্ত্রিত ছিলেন, আর তাঁরা ভাষণের দ্বারা সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করলেন। শুধু কনখলেই বিশেষরূপে ২৩শে মে হতে ২৭শে মে হরিবাবা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রাসলীলা ও গৌরাঙ্গ লীলা আয়োজিত হয়েছিল।

দেরাদুনে স্থিত কিশনপুর, কল্যাণবন ও রায়পুর আশ্রমে মায়ের পূজার সঙ্গে শ্রী রামদরবারের ষোড়শোপচারে পূজা হয়েছে।

উত্তরকাশীতে শ্রীশ্রীমা ও বাবা ভোলানাথের করকমলের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কালী মন্দিরে মায়ের বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পুনা আশ্রমের এই সমস্ত কার্যক্রমের সঙ্গে মায়ের জীবনবৃত্তের পাঠ এবং শ্রীমদ্ভাগবত সৎসঙ্গ সম্পন্ন হয়েছে। সমস্ত আশ্রমে আনুসঙ্গিক কার্যক্রম যেমন অক্ষয় তৃতীয়াতে সব মন্দিরে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা দিবস পূজা ও ঘটদান হয়েছে। কনখলে বিশেষকরে শংকর জয়ন্তী পালিত হয়েছে। বাবা ভোলানাথের জন্মতিথি, স্থানীয় প্রমুখ মন্দিরে বিশেষ পূজা, স্থানীয় হাসপাতালে ফল বিতরণ ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা যথাসম্ভব সকল আশ্রমেই অনুষ্ঠিত হয়েছে!

বারাণসী আশ্রমে অক্ষয়তৃতীয়া বিশেষ রূপে পালিত হয়েছে। আনন্দ জ্যোতির্মন্দিরে শ্রীগোপালজী, শিব, যোগমায়ার বিশেষ পূজা হয়েছে। ২৪জন সাধুর ভান্ডারা ও হয়েছে। ১৮ই মে বাবা ভোলানাথের নির্বাণ তিথির পূজা ও সাধুভান্ডারা হয়েছে। ২৫শে বুদ্ধপূর্ণিমার দিন বিশেষ কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৮ই জুন, ২০১৩ গঙ্গার তটেস্থিত মায়ের সকল আশ্রমে মা গঙ্গার সপ্রেম বিশেষ স্নান, স্তুতি, বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

ব্রহ্মচারী তন্ময়ানন্দ মহারাজ

মাতৃভক্ত মাতৃচরণাশ্রিত ব্রহ্মচারী তন্ময়ানন্দজী (হীরুদা) আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। গত ৪ঠা মে, ২০১৩ প্রায় ৯৭/৯৮ বছর বয়সে মাতৃচরণে চিরতরে লীন হয়েছেন।

ব্রহ্মচারী হীরুদা পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশ) কুমিল্লার সামগ্রামের এক অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণ জমিদার বাড়ীর একমাত্র পুত্র সন্তান ছিলেন। "চিটাগাং মেডিকেল" কলেজের চতুর্থবর্ষের ছাত্র যখন, ঈশ্বরের অমোঘ প্রেরণায় চট্টগ্রামে নারায়ণ মন্দিরে শ্রীশ্রী মায়ের প্রথম দর্শন লাভ করেন। প্রথম দর্শনেই তাঁর হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে মাতৃপ্রেমের জাগরণে অন্তরে হৃদয়বীণার তারে গৃহত্যাগের চির বৈরাগী সুর বেজে ওঠে। মায়ের দুর্নিবার আকর্ষণে অমোঘ আহ্বানে চল্লিশের দশকের প্রারম্ভে তিনি চিরতরে ঘর ছেড়ে মায়ের চরণ প্রান্তে এসে উপনীত হন। কৃপাময়ী মা নিজশরণাগত সন্তানকে স্নেহময় আশ্রয় প্রদান করলেন।

হীরুদা শ্রী ১০৮ স্বামী মুক্তানন্দ গিরিজীর (দিদিমার) প্রথম মন্ত্র শিষ্য ছিলেন। হীরুদা মায়ের বহু আশ্রমে কোলকাতায় বালিগঞ্জ আশ্রমে, দেরাদুনে কল্যাণ বনে ও কিশনপুর আশ্রমে শিব মন্দির, মাতৃ মন্দির প্রভৃতিতে পূজারী রূপে মায়ের আশ্রমের সেবায়রত ছিলেন। আমরা দেরাদুনে ১৯৫৯ সালে মায়ের জন্মোৎসবে তাঁকে শ্রীশ্রী মায়ের সাক্ষাৎ শ্রীশরীরের প্রতিদিন আরতি করতেও দেখেছি। তাঁর ভগিনী জ্যোতিদি কন্যাপীঠের ছাত্রী ছিলেন। কন্যাপীঠে তাঁর যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। পরে সে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করে।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করার পর হীরুদার নাম হয় ব্রহ্মচারী তন্ময়ানন্দ। তাঁর গানের স্বর অতিশয় মধুর ও ভাবপূর্ণ ছিল। উৎসবে তাঁর গান শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ ও আনন্দিত হতেন। মাতৃ নির্দেশে ব্রহ্মানন্দজীর (বিভুদা) পর প্রতি সংযম সপ্তাহে সকালে "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম" ভজনান্দজী (পুষ্পদি) কীর্তন করতেন ও বিকালে তন্ময়ানন্দজী "হে ভগবান" কীর্তন করতেন। ইদানীং আগরপাড়া আশ্রমে তন্ময়দা মাতৃধ্যানে মাতৃলীলা-স্মরণে ও বর্ণনে সর্বদা তন্ময় হয়ে থাকতেন। ভক্তদেরও মাতৃ কথা শ্রবণ করিয়ে বিশেষ আনন্দিত হতেন।

তাঁর আনন্দলোকের যাত্রা ও অতি সুন্দর হয়েছিল। বিশেষ অসুস্থ হওয়ায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সেখানে তাঁকে গহন চিকিৎসাকক্ষে (আই.সী.য়ু.)তে রাখা হয়। স্থির করা হল যে ৩রা মে শ্রীশ্রী মায়ের জন্মদিনের পূজা হয়ে গেলে তাঁরপর যা হয় হবে।

Br. Tanmayananda, Agarpara Ashram

পরে তাঁকে 'ভেন্টিলেটারে' দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা ছিল আশ্রমেই যেন তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ হয়। সেই অনুসারে ৩রা মে তাঁকে ভেন্টিলেটার থেকে সরিয়ে শুধু অক্সিজনের সঙ্গে আশ্রমে এনে রাখা হয়। করুণাময়ী মায়ের কৃপায় ৩রা মে সারারাত পূজা ও কীর্তনের মধ্যে কেটে যায় পরদিন ৪ঠা মে সকালে মাতৃ পূজা, ভোগ ও ভান্ডারা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। তন্ময়দার মুখে শ্রীশ্রীমায়ের মহাপ্রসাদ স্পর্শ করানো হয়। সব কিছু নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হবার পর ৪ঠা মে বিকাল ৪টা ৪০ মিঃ এ মাতৃগত প্রাণ মহাসাধক মায়ের চরণে লীন হলেন। তাঁর পারমার্থিক ক্রিয়া ও ষোড়শভান্ডারা খুব ভাল ভাবে হয়েছে। এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করে অমর পথের যাত্রীকে আমরা আজ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি। জয় মা।

উৎসব সূচী

১. গুরু পূর্ণিমা..২২ জুলাই, ২০১৩।

২. শ্রী ১০৮ স্বামী মুক্তানন্দগিরিজীর নির্বাণ তিথি..........১৩ই আগস্ট।

৩. ঝুলন মহোৎসব..১৬ই আগস্ট, ২০১৩।

৪. শ্রীভাইজী (স্বামী মৌনানন্দপর্বত) এর নির্বাণ তিথি ঝূলন দ্বাদশী.........১৮ই আগস্ট।

৫. রাখী পূর্ণিমা...২১শে আগস্ট, ২০১৩।

৬. শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী.......................................২৮শে আগস্ট, ২০১৩

৭. শ্রীমদ্ ভাগবতসপ্তাহ মহাপারায়ণ....................১১ই সেপ্টেম্বর হতে ১৮ই সেপ্টেম্বর।

৮. শ্রদ্ধেয়া গুরুপ্রিয়াদিদির নির্বাণ তিথি (ললিতাসপ্তমী).....................১২ই সেপ্টেম্বর।

৯. শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গাপূজা.................................১০ই অক্টোবর হতে ১৪ই অক্টোবর।

১০. শ্রীশ্রী লক্ষ্মীপূজা...১৮ই অক্টোবর, ২০১৩।

১১. শ্রীশ্রী কালী পূজা..২রা নভেম্বর, ২০১৩।

১২. অন্নকূট...৪ঠা নভেম্বর, ২০১৩।

শোক সংবাদ

১। শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ময় মুখার্জী (গৌরদা)—

শ্রীশ্রী মায়ের পুরাতন ভক্ত গৌরদা গত ৩১শে মার্চ, ২০১৩ রবিবার সন্ধ্যায় ৬ : ৪৫ মিনিটে সজ্ঞানে নিজ সাধনোচিত ধামে গমন করেছেন। উনি শ্রী পরেশনাথ মুখার্জীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ও ১৯৪৫ সালে বিন্ধ্যাচলে শ্রীশ্রী মায়ের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। গৌরদার গান শ্রীশ্রীমা শুনতে খুব ভালবাসতেন। তিনি ও তাঁর স্ত্রী শোভা রানী দেবী শ্রী মুক্তানন্দগিরিজীর (দিদিমার) কাছে রাজগীরে দীক্ষিত হয়েছিলেন। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি ও শ্রীশ্রী মায়ের চরণে শায়িত থাকুন এই কামনা করি। পরিবার বর্গের জন্য সান্ত্বনা প্রার্থনা করি।

২. শ্রীমতী সীমা চ্যাটার্জী—

মাতৃভক্ত শ্রী নির্মলেন্দু চ্যাটার্জীর সহধর্মিনী শ্রীমতী সীমা চ্যাটার্জী গত ২৮শে এপ্রিল, ২০১৩ নিজ সাধনোচিত ধামে গমন করেছেন। প্রয়াত আত্মার চির শান্তি প্রার্থনা করি মায়ের চরণে ও পরিবারবর্গের জন্য সান্ত্বনা কামনা করি।

Shree Shree Ma Anandamayee Satsanga Sammilani
Salt Lake, Kolkata

"মা আছেন কিসের চিন্তা ?"
শ্রী কৌশিক ঘোষ
মুরারী ভাণ্ডার
ও
মুরারী ট্রেডার্স
৩৪২, জি.টি. রোড, বর্ধমান – ৭১৩১০১

শ্রীশ্রী মায়ের শ্রীচরণ কমলে—

শ্রীমতী সন্ধ্যা রাণী দত্ত
পি. এন. বসু কম্পাউন্ড
রাঁচী—834001
ফোন— 0651-2532297

"এ শরীরের কাছে যারা এসেছে
তাদের আর পতন নেই।"

—শ্রীশ্রী মা

"এ শরীরের কাছে যারা এসেছে তাদের আর পতন নেই। এমন কি যারা মনে করেছে তাদেরও।"

— শ্রীশ্রীমা

"ঐ শরীরের আত্মা সকলের আত্মা
কাউকে না হলে চলেনা — চলবেনা।"
শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি
— শ্রী স্বপন গাঙ্গুলী

শ্রীশ্রীমার শ্রীচরণে

শতশত প্রণাম

—ভুবনেশ্বর রাইস্ মিল

এলানগঞ্জ, বর্দ্ধমান
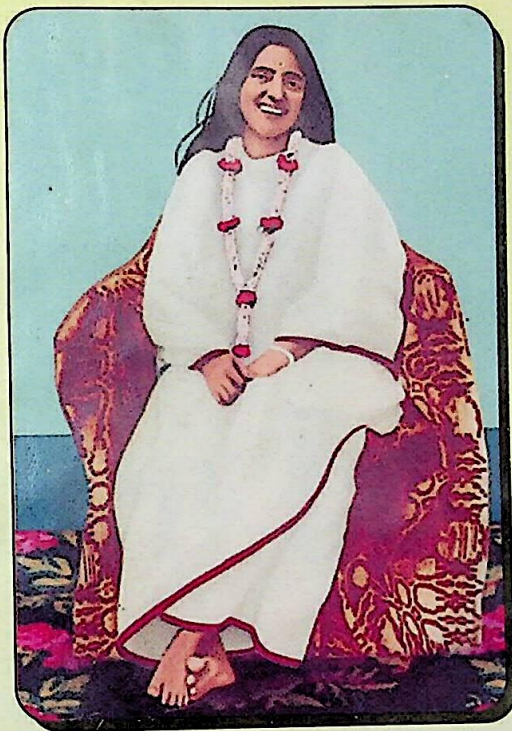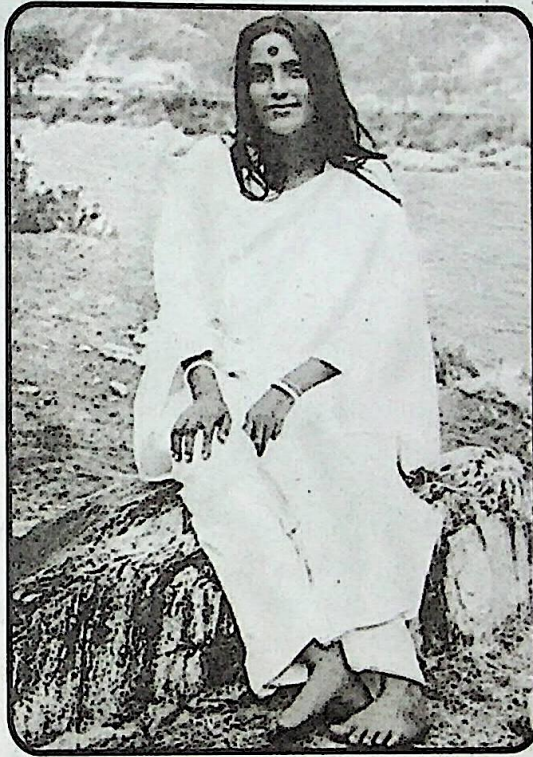
"Man must aim at the superman, at real greatness. The traveller on the supreme path may hope to attain to the aultimate Goal. This is man's main duty."

—Shree Shree Ma

A Devotee

"It is the duty of a human being to make human birth, which is such a rare boon, successful. Otherwise he has to continue in the round of births and deaths."

—Shree Shree Ma

Sri N.K. Banerjee

14. NEW DELHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kalkaji, New Delhi-110019 (Tel. : 011-26826813)
15. PUNE : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Ganesh Khind Road, Pune-411007, (Tel. : 020-25537835 & 25538903)
16. PURI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Swargadwar, Puri-752001, Orissa. (Tel. : 06752-223258)
17. RAJGIR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P. O. Rajgir, Nalanda-803116, Bihar (Tel. : 06112-26105811)
18. RANCHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Main Road, P. O. Ranchi-834001 (Tel. : 0651-2331181)
19. TARAPEETH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P. O. Chandipur-Tarapeeth, Birbhum-731233
20. UTTARKASHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kali Mandir, P. O. Uttarkashi-249193. (Tel. : 01374-224343)
21. VARANASI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi-221001, U. P. (Tel. : 0542-2310054+2311794)
22. VINDHYACHAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Ashtabhuja Hill, P. O. Vindhyachal, Mirzapur-231307, (Tel. : 05442-290977)
23. VRINDABAN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P. O. Vrindaban, Mathura-281121 U. P. (Tel. : 0565-2442024)

*

BANGLADESH :

1. DHAKA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 14, Siddheshwari Lane, Dhaka-17 (Tel. : 008802-8333917)
2. KHEORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kheora, Via-Kasba, Brahmanbaria.

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS
FOR INDIA AS NO. 65432/97

Printed by : Ratna Offsets Ltd., Kamachha, Varanasi.